বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 609. May, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

৫১ বর্ষ। ৬০৯ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩২১। মে, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	ম	শু	সো	শু	ম	শু
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
	বু	র	বু	সো	বু	শ
†	A	M	J	Jy.	Au	S
‡	14	15	15	17	18	18
আঃ	বু	শু	সো	বু	শ	ম
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	বু	র	ম	শু	সো	বু

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সাল।
ফসলী ১৩২১—২২।
হিজরী ১৩৩১—৩২।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪—১৫।
শকাব্দ ১৮৩৬।
সংবৎ ১৯৭১—৭২।
মগী ১১৭৬—৭৭।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৫—৮৬।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	র	ম	বু	শু	শ	সো
শেঃ	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
	সো	ম	বু	শু	র	ম
	O	N	D	J	F	M
	18	17	16	15	13	15
আঃ	বু	র	ম	শু	সো	সো
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	শ	সো	বু	র	র	বু

ম	শু	সো	শু	ম	শু
বু	শ	ম	শ	বু	শ
বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শু	সো	বৃ	সো	শু	সো
শ	ম	শু	ম	শ	ম
র	বু	শ	বু	র	বু
সো	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ

§				
১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু
শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	র

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	২০	২১	২০	১৭	১৪	১৩
পূঃ,	২৬	২৫	২৩	২২	১৮	১৭
কৃঃ এঃ,	*	৬	৫	৩,৩১	৩০	২৮
অঃ,	১২	১১	৯	৭	৪	২

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।
*** ২৩শে বৈশাখ বুধবার ও ২১এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, শুক্ল একাদশী।
২৬শে বৈশাখ শনিবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার পূর্ণিমা।
৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার কৃষ্ণ একাদশী।
১২ই বৈশাখ শনিবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ মঙ্গলবার আরম্ভ ও ৩১শে বৃহস্পতিবার শেষ।
১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।
† A এপ্রেল, আরম্ভ বুধবার শেষ ৩০শে বৃহস্পতিবার।
‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।
§ ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ২রা বুধবার, ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ২রা শনিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ মঙ্গলবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৩
পূঃ,	১৬	১৬	১৭	১৭	১৭	১৭
কৃঃ এঃ,	২৮	২৭	২৮	২৭	২৭	২৭
অঃ	২	১	২	১	২	১

*** ১২ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার শুক্ল একাদশী। ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার ও ১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা।
২৮শে কার্ত্তিক শনিবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ২রা কার্ত্তিক সোমবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষের চিন্তা।

১। স্বভাবের যেরূপ নিয়ম তাহাতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। একটী বৃক্ষ জন্মিল, পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিল, পরে তাহা রসহীন হইয়া—পত্র-পুষ্প-ফল-বিহীন হইল—শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আবার তাহাতে নূতন পত্র, পুষ্প ও ফল দেখা দেয় কেন? প্রতিবর্ষে ত এইরূপ হইতেছে। মৃত্যুর মধ্যে যে অমৃতের বীজ রহিয়াছে ইহা তাহারই পরিচয়।

২। মানবজীবন বৃক্ষ ও পশুপক্ষীর জীবন অপেক্ষা কি উৎকৃষ্ট নয়, তবে এ জীবনের মৃত্যু কোথায়? "করিয়া দুখ অন্ত সুবসন্ত (হৃদে) জাগে।"

৩। নববর্ষ, নব বসন্ত, ভগ্ন প্রাণে নূতন উৎসাহ আনিয়া দেয়।

৪। এই জীবনের রস লইয়া সঙ্কল্প, সাধনা ও বিশ্বাস দ্বারা আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি।

৫। বিশ্বামিত্রের সাধনা—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবেন—যাহা হইবার নয়, তাহাই হইতে হইবে। কি দৃঢ় সঙ্কল্প, কি কঠোর সাধনা, কি পরিণাম-ফলে বিশ্বাস—তাহাকে ব্রহ্মা অন্য বর দিতে আসিলেন—ঋষি কিছুতেই সম্মত নয়। শেষে ব্রহ্মা আপনার যজ্ঞসূত্রে তাহাকে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণ করিলেন। তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ হইলেন।

৬। আমাদের জীবনের লক্ষ্য সাধনের জন্য সেইরূপ সঙ্কল্প, সাধনা ও বিশ্বাস অবলম্বন করিতে পারিলে আমরা কেন কৃতকার্য্য হইতে পারিব না? মনুষ্য যাহা করিয়াছে, মনুষ্য তাহা করিতে পারে।

৭। সকল দেশের, সকল কালে মনস্বীরা এইরূপে মহৎ লক্ষ্য সাধন করিয়াছেন। আমরা নিরাশ ও জড়প্রায় না হইয়া জীবনের পথে চলিয়া অমৃতের অধিকারী হইব।

হিন্দুশাস্ত্র—

৮। প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা
চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্ম-
ঘাতকঃ॥

উত্তম মানবজন্ম এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়।

৯। একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে
হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং
শ্রেয়োধিগচ্ছতি॥

প্রতিদিন নির্জনে একাকী আত্মহিত চিন্তা করিবেক, একাকী আত্মহিত চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

১০। যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং
যচ্চ দুস্তরম্।

তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপোহি
দুরতিক্রমঃ ॥

যাহা দুষ্কর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম ও যাহা দুস্তর, সে সকলই তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তপঃপ্রভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

১১। কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ
পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যে
পূয়তে তু সঃ ॥

পাপকর্ম্ম করিয়া সন্তপ্ত হইলে সেই পাপ হইতে মানব মুক্তি লাভ করে। "এরূপ কর্ম্ম আর করিব না।" বলিয়া যে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সে পবিত্র হয়।

১২। মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো
নাস্তি পাপহা।
ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপেভ্যস্ত্বৎ-
প্রসাদাৎ মহেশ্বর।

হে মহান্ ঈশ্বর, আমার সমান মহাপাতকী নাই এবং তোমার সমান পাপহারী কেহ নাই, অতএব আমাকে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।

খৃষ্টান্ শাস্ত্র—

১৩। Take care of your heart, for out of it are the issues of life.

তোমার হৃদয় পবিত্র রাখিতে যত্নশীল হও, কারণ জীবনের উৎস সকল ইহা হইতে উৎসারিত হয়।

১৪। Verily I say unto you, a man cannot be saved unless he is born again.

আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তোমরা পুনর্জাত না হইলে মুক্তি পাইবে না।

১৫। For if ye live after the flesh ye shall die; but if ye through the spirit mortify the deeds of the flesh ye shall live.

যদি তোমরা ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইয়া চল, তোমরা মরিবে। কিন্তু যদি তোমরা আত্মার মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়জনিত কার্য্য সকলকে দমন করিতে পার, তোমরা জীবন পাইবে।

১৬। For as many as are led by the spirit of God, they are the sons of God.

যতগুলি লোক ঐশ্বরিক-ভাব দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের সন্তান।

১৭। The spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God.

আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের আত্মার সহিত পরমাত্মা তাহার সাক্ষী।

১৮। And if children then heirs, heirs of God and joint heirs with Chirst, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together.

যদি আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তাহা হইলে উত্তরাধিকারী, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হইলে আমরা যিশুখৃষ্টের সম-উত্তরাধিকারী, তাঁহার সঙ্গে কষ্টভাগী হইলে তাঁহার সহিত একত্র গৌরবেরও অধিকারী হইব।

১৯। For I reckon that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.

ভবিষ্যতে যে মহিমা প্রকাশিত হইবে, তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের কষ্ট গণনার মধ্যেই আসে না।

২০। Create in me, O God, a holy heart and renew a right spirit within me.

হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে পবিত্র হৃদয়ের উদয় করিয়া দেও এবং আমার অন্তরে সত্যভাব নবীভূত কর।

মুসলমান শাস্ত্র—

২১। ঈশ্বরবিশ্বাসী চির-আশান্বিত, চির-উৎসাহবান্ ও চির-উন্নতিশীল।

জেন্দাভেস্তা—

২২। ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—সে এইজন্য যে তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন হইতে দিবে না, মৃত্যু হইতে দিবে না, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না। কিন্তু তাহারা এই মর্ত্ত্যধামকে চিরজীবন্ত করিবে —চির-ফলপ্রদ করিবে এবং ইচ্ছানুরূপ সুন্দর রাজ্যে পরিণত করিবে। এইজন্য মৃতব্যক্তিরা পুনরুত্থান করিবে এবং জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে যাহাদ্বারা তাহাদের ইচ্ছামত পৃথিবীকে সুন্দর স্বর্গধাম করিয়া তুলিবে।

ওঁ সত্যমেব জয়তে।

নব বর্ষের বাসনা।

আজি, নূতন বরষে, পরম হরষে,
সাজায়ে এনেছি ডালি।
নবীন চন্দনে, মথিয়ে পরাণে,
পূরায়ে অর্ঘ্যস্থালী।
নাথার চরণে, তীব্র আশা মনে,
রয়েছি দুয়ার খুলি'।
এস এস হরি, প্রাণতৃপ্তিকারী,
রয়েছি নয়ন মেলি'।
বর্ষ পরে বর্ষ, বিষাদ ও হর্ষ,
লয়েই আসে যায় চলি'।
কেঁদে হেসে দিন, শুধু হয় ক্ষীণ,
রেখেছ চরণে ঠেলি'।
বায়ুর পরশে মেঘ যায় ভেসে,
বর্ষেনাক ধারাগুলি।
শূন্য সিংহাসন, করিব বহন,
বল দেব বল খুলি'।
এনে বিশ্বগেহে দিয়ে শত স্নেহে
সদা রহ কুতুহলী।
আমি শূন্য মনে, রহি অন্বেষণে,
পথ কি দিবে না বলি?
নববর্ষ সনে, আশা জাগে মনে,
নব প্রাণ পাব বলি'।

না হয়ে সফল,　　নিয়ত বিফল,
অতৃপ্ত পিয়াসে জ্বলি।
দিবে নাক দেখা　　হৰ চির একা,
মহৎ আকাজ্ক্ষা দলি'?
নহে মনোলোভা,　এই বিশ্বশোভা,
পরাণ না রহে ভুলি'।
সদা চিত ধায়　　আছহে যেথায়
অবাক্ত অজ্ঞেয় বলী।

তাই এ নূতনে　　ডাকি প্রাণপণে
এনে দিবে পদধূলী।
সার্থক নূতন　　বাসনাপূরণ
এস হে প্রাণ উজলি'।
নবীন পরাণ　　লয়ে নব জ্ঞান
সকলি দিবহে ডালি।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

৪র্থ প্রস্তাব।

মিথ্যা কথাকে সর্ব্বদা এরূপ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া ভাবিবেন যে, আপনার সন্তানের পক্ষে তাহা করা অসম্ভব হইবে। সন্তানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিবেন—'আমার সন্তান কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।' সে অমনি আনন্দে মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিবে—'না মা! আমি কখন মিথ্যা কথা বলিব না'। আর জননীগণ ইহাও মনে রাখিবেন যে, পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে বালক-বালিকারা কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শিখে না, সে জন্ত তাহাদিগকে ঐ সময় হইতে সত্য কথা বলিতে অভ্যস্ত করাইলে, তাহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিবে না।

শিশুকে যত স্বাধীনতা দিয়া প্রেমের দ্বারা শিক্ষা দিবেন, তত সে মিথ্যা কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিবে। ভয় ও দুর্ব্বলতা মিথ্যার জন্ম-দাতা, এজন্ত সন্তানকে সর্ব্বদা দৃঢ়তার সহিত নিজের কথা ও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে শিখাইবেন, আর ভুলিয়াও কখন সন্তানদিগের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিজেদের কথা বজায় রাখিবেন। মাতার প্রতিজ্ঞা-পালন ও ক্লেশ-স্বীকার দেখিয়া সন্তানও নিজের প্রতিজ্ঞা ও কথা রাখিতে শিখিবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয় তরুণবয়স্ক পিতামাতারা অতি অল্পই জানেন যে, তাঁহাদের শিক্ষা ও প্রকৃত যত্নের অভাবে, শিশুর কত নৈতিক জ্ঞানের বীজ বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে পিতামাতারা আগে আপনা-দিগকে সকল বিষয়ে পারদর্শী ও যথার্থ-রূপে শিক্ষিত করিবেন।

শিশুদিগকে ভুলাইবার জন্ত মিথ্যা কথা

বলা বা অন্য কোন প্রকারে প্রতারণা করা অত্যন্ত অন্যায়। তাহাদিগকে কোন কথা বাড়াইয়া বলাও পিতামাতার উচিত নহে, এবং শিশুগণও যাহাতে ওরূপ না বলে সে বিষয়ে তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন। কোন বিষয় বাড়াইয়া বলা পাপ না হইলেও উহা অসত্য, এবং অভ্যাস করিলে শিশুকে পরজীবনে উহার জন্য অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে। শিশুগণ সম্পূর্ণ পরিষ্কার বোধশক্তির অভাবে প্রায় সর্ব্বদাই সকল বিষয়ের বর্ণনা বাড়াইয়া করে। দশ হাজার পিতামাতার কাছে যত শুনায়, তাহার তত বোধ হয় না, কেননা সে ত জানে না, একশ' কত? সেজন্য সে যদি বলে—"আমি বড় হয়ে অমুককে দশ হাজার টাকা দিব," বা "ওখানে দশ হাজার লোক ছিল," তাহাতে আপনার অবিশ্বাস হইলেও উহা হাসিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, আর উহাতে কোন দোষ ধরিবেন না। সেইরূপ দূরত্বের পরিমাণেও শিশুরা বাড়াইয়া থাকে। কোন দ্রব্য সে হাতে না পাইলে অনায়াসে বলে ওটা মেঘের মত উচুঁতে আছে, তাহার কাছে মেঘ অতি দূরে নয়। কেননা সে প্রতিরাত্রে মার কোলে বসিয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে চায়, আর জননী ইচ্ছা করিলেই চাঁদকে নীচে আনিতে পারেন, এই তার বিশ্বাস। সুতরাং সন্তানদের ওরূপ কথা অযথার্থ হইলেও উহা মিথ্যা নয়। সে জন্য ঐ সকল কথা হাসিয়া আদরে গ্রহণ করাই পিতামাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু সন্তান যখন কোন দ্রব্য বা দৃশ্য দেখিয়া তাহা অত্যন্ত বাড়াইয়া বলে, তখন তাহাকে স্মরণ করাইয়া সকল কথা ঠিক করিয়া বলিতে শিখাইবেন, তাহা হইলে সে নিজেই নিজের ভুল শুধরাইয়া লইবে। কোন বিষয় সে যদি ভুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ভয়ে বা লজ্জায় মিথ্যা বলিতে দিবেন না, বরং মিষ্ট কথায় ও বিনা তাড়নায় তাহাকে সত্য ঘটনা স্মরণ করিতে বলিবেন। শিশুকে কোন কার্য্য বা বিষয় গোপন রাখিতে শিক্ষা দিবেন না। কেননা, কথা বা কার্য্য গোপন রাখার অভ্যাস, বিশেষে অন্যান্য নৈতিক জ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। সে কারণে অতি অল্প বয়সে কোন বিষয় গোপন রাখিবার চেষ্টা পাইলে শিশুর মনে অসত্যবাদিতার অঙ্কুর জন্মাইবার সম্ভাবনা। সত্যবাদিতা মানুষের নৈতিক স্বভাবের মূল-স্বরূপ। সেজন্য উহার উপর অন্যান্য সমুদায় সদ্‌গুণের চর্চ্চা ও বৃদ্ধি একান্ত নির্ভর করে। প্রথম হইতেই শিশুকে সুশিক্ষা দিলে সে উহাতে আপনা হইতে অভ্যস্ত হইবে।

সত্যবাদিতা হইতে আমরা সহজেই লজ্জার কাছে আসি। শিশুকে লজ্জা শিখাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কেবল তাহার চক্ষু ও কর্ণকে সমুদায় অশ্লীল দৃশ্য ও কথা হইতে সযত্নে দূরে রাখুন ও তাহার শরীরকে পবিত্র রাখিতে শিক্ষা দিন। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ সে

কোন নির্দ্দোষ লজ্জায় কাজ করে, তবে তাহা পুনরায় করিতে নিষেধ করুন। একবার ইহাতে 'ছি!' বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিলে, সে উহা আর কখনও করিবে না। এই বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার নাই; কেননা, শিশু লজ্জা বোধ করিবে কেন? ঈশ্বর তাহাকে যেমন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সেইরূপই হইয়াছে। আর এ জগতে শিশুপ্রকৃতির ন্যায় কোন্ দৃশ্য অধিক মনোহর? সেজন্য শিশুকে গৃহের মধ্যে বা সাধারণ স্থানে অধিক কাপড় পরাইয়া তাহাকে কষ্ট দিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের হানি না করিয়া সহজভাবে আরামে খেলিতে দেওয়া জ্ঞানী লোকের কাজ।

সত্যবাদিতা যেমন শিশুর নৈতিক স্বভাবের পুষ্প-স্বরূপ, লজ্জাকে তেমনি উহার কলিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। পিতামাতার বিশেষ যত্ন বিনাও উহা একটু একটু করিয়া শিশুর চরিত্রে প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রথম হইতে পিতামাতা যত সতর্ক হইয়া সন্তানকে দূষিত দ্রব্য ও আচার-ব্যবহার হইতে দূরে রাখিয়া শুধু সুন্দর, পবিত্র, মিষ্ট দৃশ্য ও আলাপে ঘিরিয়া রাখিবেন, ততই সে লজ্জাকর কাজ বা বিষয়ের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত থাকিবে। সন্তানকে যেরূপ সুন্দর করিতে ইচ্ছা করেন, পিতামাতা নিজে সেইরূপ হইলেই শিশুর জন্য আর কোন ভাবনা থাকিবে না।

বালকবালিকাদিগকে সর্ব্বদা পৃথক রাখিতে চেষ্টা করিবেন না, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা একত্র লালিত হইলে তাহারা যে অধিকতর সৎ, শিষ্টাচারী ও সচ্চরিত্র হয়, তাহা আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার উদাহরণে স্পষ্ট জানিতে পারি। ঐ সকল দেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই একত্র শিক্ষিত হয়। স্কুল হইতে কলেজ পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েরা একভাবে ও এক সঙ্গে জ্ঞান-সুধা পান করে। সেজন্য ঐ সমস্ত দেশের ন্যায় আর কোন দেশে পুরুষেরা স্ত্রীলোককে অত মান্য করিয়া চলে না। অন্যান্য অনেক প্রকৃত ও উত্তম ঘটনার মধ্যে এই বিষয়টীতেও এ দেশবাসীদিগের ঐ সকল দেশের লোকের নিকট হইতে উপদেশ ও আদর্শ লওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের লোকেরা এখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঐ পবিত্র ভ্রাতাভগিনী-ভাব বুঝিতে অক্ষম। কাজেকাজেই তাঁহারা যেমন অসময়ে বালকবালিকাদিগের মনে দাম্পত্য প্রেমের উদ্রেক করেন, সেইরূপ অকালেই তাহাদের মনে অস্বাভাবিক লজ্জারও বীজ রোপণ করেন।

পুত্রকন্যাদিগের লজ্জার জন্য পিতা-মাতার কোনরূপ উতলা হইবার আবশ্যকতা নাই, স্বাভাবিক বিধানানুসারে তাহাদের শরীর ও মন প্রস্ফুটিত হইলে, লজ্জা আপনা হইতেই তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে। প্রথম হইতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বালকবালিকারা মিথ্যা লজ্জাবশে অকালে পরস্পরের কাছ হইতে ভয়ে পলাইবে না বা পরস্পরের সঙ্গে

নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। কিন্তু কোন অপবিত্র কথা বা ক্রীড়ার নিকটস্থ হইবামাত্র তাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিবে, ঘৃণা বা রাগে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইবে।

৫ম প্রস্তাব।

যখন কোন ভাষায় "ঈশ্বর" শব্দ শুনা যায়,উহা আপনা হইতে চক্ষুকে উপর দিকে ফিরায়। কিন্তু শিশু কিরূপে উপর দিকে তাকাইতে শিখিবে? মানুষের নৈতিক জ্ঞানের উচ্চতম পুষ্টিসাধনের ফল ধর্ম্ম, এবং শিশু অতি সুন্দররূপে তাহার প্রথম আভাস পায়। গল্প বা কল্পনা দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বা ভক্তি শিক্ষা দিবেন না, কিন্তু উচ্চতম ও পবিত্রতম ভাব ও কার্য্যের দ্বারা সে যেন উহা অনুভব করিতে পারে। কোন অসাধারণ নৈসর্গিক ঘটনা, বা হর্ষ, ভয় ও দুঃখের সময় ঈশ্বরের নাম করিলে, শিশু নিজেই কোনও মহাকাণ্ড বা অসাধারণ শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের নাম যোগ দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে শিখিবে। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারক মেধাবী নিউটন বাল্যকাল হইতে এরূপভাবে ধর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের নাম শুনিবামাত্র, তিনি মাথার টুপি খুলিয়া জগৎপিতাকে নমস্কার করিতেন। সে কারণে পরমাত্মার নামের সঙ্গে শিশুকে পবিত্রতা ও ভক্তিভাব বুঝিতে দিলে ঐ বিশুদ্ধ বাতাসের নীচে তাহার মনে অতি উচ্চ ও পবিত্র ভাবের উদয় হইবে। অনন্ত জ্ঞান অল্পে অল্পে বোধগম্য নয়। কিন্তু সময়ে শিশুর আত্মা ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে সে অবশেষে উহা মনে ধারণা করিতে ও অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে।

অনন্ত ও অজ্ঞেয় সমুদায় বিশ্ব শিশুতে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, নতুবা কথা দ্বারা কখনও তাহার মনে ঐ ভাবের সঞ্চার করা যাইত না। সেই কারণে যখন মাতার পবিত্র আত্মা শিশুর পবিত্র আত্মার সহিত কথা কহেন, শিশু তখন উহা বুঝিতে সক্ষম হয়। কেননা প্রকৃত ঘটনার পূর্ব্বে যেমন কল্পনার সৃষ্টি, দোষের পূর্ব্বে নির্দ্দোষিতার আবির্ভাব, সেইরূপ শিশুর মনে অপবিত্রতার পূর্ব্বে পবিত্রতার উদয় হয়। সন্তান যখন মাতার কাছ হইতে কোন দ্রব্য পাইলে উল্লাসে মাতার গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করে। ও তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাকে ঐ দ্রব্যের জন্য জগৎপিতাকে নমস্কার করিতে শিখাইবেন। তাঁহার দয়া ও ইচ্ছা বিনা আপনার উহা দিবার কোন ক্ষমতা নাই, এবং তিনি আপনার অপেক্ষা কত মহত্তর—শিশুর মনে এই জ্ঞান বদ্ধ করিয়া দিবেন। তাহাকে বলিবেন যে, সে ভাল সন্তান হইলে ও মার কথা নি... ঈশ্বর তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, কেননা তিনি আমাদিগের সকল কাজ দেখিতে পান। পরে তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে উঠিবার ও রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ও তাঁহার কথা ভাবিতে শিখাইবেন। যত

সরল ভাবা সে বুঝিতে পারে, তার প্রার্থনা তত সরল ও ছোট হওয়া আবশ্যক। শিশুকে যোড়হস্তে ও উর্দ্ধমুখে এক মুহূর্ত্ত মাত্র ঐ পবিত্র দেবতার জ্যোতি বুঝিতে দিবেন, তাহা হইলে সে বড় হইয়া কখন ঐ মহাজ্যোতি ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে না।

আহারের পর শিশু যেন আহার-দাতাকে ধন্যবাদ দিতে শিখে। বাহিরে খেলিবার সময় শিশু যেন জানিতে পারে যে, মাঠ, বন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, আকাশ, পশুপক্ষী—সকলই সেই পরম পিতার মনোহর সৃষ্টি। তাহাকে পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখাইবেন, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও গঠনে তাহারা কি অনুপম পদার্থ, কত অসীম জ্ঞান দ্বারা পশুপক্ষিগণ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কেমন তাহার নিজের হস্তপদের মত নড়ে তাহাকে বুঝাইবেন। ইহা দেখাইয়া তাহাকে বলিবেন যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ কোন পদার্থ বা জীব সৃজন করিতে সমর্থ নয়। এইরূপে কোন অলীক জ্ঞান ও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কোনরূপ ভয় বা শঙ্কা উৎপাদন ব্যতীত শিশুর সরল আত্মা ঈশ্বর-প্রেমে ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়।

জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর ইহা অপেক্ষা গভীরতর বিষয় সকল শিশুকে বুঝাইবার প্রয়াস করা বৃথা, ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ জীবনের পূর্ণ অবস্থার জন্যই রাখা ভাল।

উপরে লিখিত মূল কথাগুলি শিশু-দিগকে নৈতিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার ভিত্তি স্বরূপ। পিতামাতা তাহাদিগকে যত্ন ও আদরের সহিত পালন করিবেন, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তাহাদের কথা তাঁহাদিগের মন হইতে অপসৃত না হয়। তাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, শিশুকে সম্পূর্ণ মানুষ করিবার ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, সে জন্য তাঁহাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তও এই সৎকার্য্যে ব্যয় করা আবশ্যক। আর শিশুর অবস্থা ভাবিয়া আপনাদিগকে তাহার সমান মনে করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহাকে যে উপদেশ দেন বা যে কাজ করিবার আজ্ঞা করেন, তাহা তাহা-দিগের বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া বলিবেন। কেননা, তাহারা সকল বিষয় নিজেদের উপযোগী করিয়া লইয়া তাহার ভাব গ্রহণ করিতে অপারক।

শিশুর শিক্ষা সকল দিকেই সমান হওয়া উচিত, তাহাতে তাহার শরীর, মন ও প্রকৃতি এককালে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হইবে। ঐরূপে শিক্ষা দিলে বাল্যকালে যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, পরজীবনে তাহা হইতে সুফল জন্মিয়া পিতামাতাকে আনন্দিত ও পুরস্কৃত করে। জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পিতামাতা শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের ছবি দেখিতে পাইবেন, এবং উচ্চ আশার সহিত, যাহার অন্তরে ধর্ম্ম-নীতির বীজ বপন জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাহার চিরমঙ্গলের জন্য পরম পিতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

শোকাশ্রু।

(ভারতগৌরব জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী জগত্তারিণী দেবীর পরলোক গমনে)

কি শুনিনু—বজ্রধ্বনি,
চলি গেছ দিদিমণি,
সমস্ত অবনীমাঝে তুমি নাকি নাই ?
আজি সেই পূত স্নেহ,
সে পবিত্র দিব্য দেহ,
সবি নাকি গঙ্গাতীরে হয়ে গেছে ছাই। ১

কি শুনিনু—গেছ তুমি,
ধরা করি মরুভূমি,
আঁধারি সে রাজপুরী আনন্দ-ভবন,
সেই কথা সেই হাসি,
সেই করুণার রাশি,
সবি নাকি ফুরা য়েছে স্বপ্নের মতন ? ২

শুনিয়া স্নেহের ভাষা
কভু যে মিটেনি আশা,
দীন দেশে তুমি যে গো অমূল্য রতন,
কত ব্যথী গিয়া ছুটি
চরণে পড়েছে লুটি,
আদরে আশ্বাসে বক্ষে করেছ গ্রহণ। ৩

শত তাপ-তপ্ত হিয়া,
স্নেহ কত জুড়াইয়া,
করিয়াছ শুষ্ক প্রাণ কত সুশীতল,
তব দ্রব করুণায়,
ভাসাইয়া আপনায়,
পেলে কত দগ্ধ-হিয়া আরাম নির্ম্মল। ৪

শিশু সম সরলতা,
বুকভরা মধুরতা,
ভুলিবার কথা সে কি মানব-জীবনে ?
দেখেছে যে একবার
সার্থক জীবন তার,—
দেবতা-দর্শন তার পার্থিব নয়নে ! ৫

দেবীরূপা সাধ্বী সতী,
ধর্ম্মশীলা পুণ্যবতী,
দয়াময়ী তপস্বিনী পর-হিত-রতা,
উদারতা বিশ্বোদর,
চিত্তে নাহি আত্ম পর,
তোমার সংসারে মাখা করুণা মমতা ! ৬

তাই দেবি ! বিধাতার
পেলে শুভ পুরস্কার,
দেবতুল্য পতিপুত্র—যোগ্য পরিজন,
তাই তুমি পেলে দিদি,
"আশু" দেশোজ্জ্বল নিধি,
মহারত্ন-প্রসবিনী উজলি ভুবন ! ৭

আর না লিখিতে পারি,
ঝরিছে নয়নবারি,
তোমা বিনা শূন্য আজি সমস্ত হৃদয়,
আমাদের হেথা ফেলে,
সত্য তুমি চলি গেলে,
পতি পুত্র কন্যা যথা অমর-আলয় ? ৮

লেখিকা শ্রীমা—

ঈশ্বরকে কোথায় অন্বেষণ করিতে হইবে ?

অনন্ত কাল ধরিয়া কত যোগী, ঋষি, মুনি সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অন্বেষণে ব্যস্ত রহিয়াছেন! কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ বেলাভূমিকে আঘাত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গেল!—কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি? কোথায় তিনি? —'কোথা গেলে পাব হরি, কোথা গেলে পাব হরি?'—

আহা! যদি জানিতাম কোথায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়! 'O that I knew where I might find God!' কত বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা জব (Job) ঐ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত করিয়া গিয়াছেন!!—ইহা কি কেবল মহাত্মা জবেরই নিভৃত হৃদয়-কন্দরের কথা? না না, মানবজাতিরই ঐ বাক্য—'হায় যদি জানিতাম কোথায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়!'

যদি মানবপ্রাণের ভাষা অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুগে যুগে প্রতিনিয়তই জীবনপথে বিভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত পথিকও ঐ কথা বলিতেছে—'হায় যদি জানিতাম কোন্ স্থানে গমন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়!' ঐ সংসারভারে ভারাক্রান্ত নরনারীর হৃদয়ের বাণী যদি কদাপি শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় সেই স্থানেও সেই একই কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে—'হায় যদি জানিতাম কোন্ স্থানে গমন করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব?' যদি গভীর সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জিত আমাদিগের পৃথিবীবাসী ভ্রান্ত ভ্রাতার প্রাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে দেখা যায় সে স্থানেও সেই একই কথা—'O that I knew where I might find Him'! সকল দেশে, সকল কালে, মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনিতে, তাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সেই এক পুরাতন বাণী—'O that I knew where I might find Him.'

জগতের সমুদায় ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মানব তাহার শুষ্ক ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া কখনও তুষ্ট থাকিতে পারে না। যত দিন মানব তাহার জীবন্ত, জাগ্রত দেবতার উপর প্রেম, বিশ্বাস ও প্রীতি স্থাপন করিতে না পারে, ততদিন সে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যতদিন পর্য্যন্ত সে তাহার কল্পনার দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত পরমেশ্বরে প্রীতি অর্পণ করিতে না পারে, তত দিন সে শান্তিলাভ করিতে পারে না।

ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিবার জন্য জগতে নানা যুক্তিপূর্ণ তর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু গভীর গবেষণা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এক মানবাত্মার সাক্ষ্যই ভগবৎসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যুক্তি তর্ক কদাপি তাঁহার সত্তা প্রমাণ

করিতে সক্ষম নহে। এই জন্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।—' 'মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।' তাঁহারা আরও বলিয়াছেন 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈ-স্তপসা কর্ম্মণা বা'—তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' ভগবান্‌কে জানিবার জন্য মানবপ্রাণের ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়।

তীরস্থ ভূমিকে প্লাবিত করিবার জন্য উত্তাল তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ উদ্বেলিত জলধিবক্ষ যখন সন্দর্শন করা যায়, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও মহতী শক্তি ইহার মূলে কার্য্য করিতেছে। তদ্রূপ যখন মানবের চিন্তা এবং ভাবের স্রোত কোনও উচ্চ আশা বা কোনও মহত্ত্বের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তখন স্পষ্টই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, কোনও ঐশী শক্তি মানবাত্মাকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবার জন্য কার্য্য করিতেছে। যখন আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করি, যখন ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি, তখন মানব-প্রকৃতির এই প্রধান অভাব দেখিতে পাই—'হায় যদি জানিতাম কোন্ স্থানে গমন করিলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়!' ইহাই মানবের প্রধান অভাব যে, সে জানে না ভগবৎসন্দর্শন কোথায় লাভ হয়। এই নিমিত্তই সে ভীষণ আর্ত্তনাদ করে—'হায় যদি জানিতাম কোথায় ঈশ্বর লাভ হয়!'

এই প্রশ্নের তিনটী উত্তর আছে। যথাক্রমে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।—

১। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, ছিল না, হবে না, হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে জানিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা জানি, নাস্তিকবাদ কখনই জয়লাভ করিতে পারে না। ধ্বংসোন্মুখী মানব-প্রকৃতির ইহা লক্ষণমাত্র। হিরণ্যকশিপুর ধ্বংসের প্রাক্‌কালে সেও এই নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়াছিল, শিশুপালবধের সময়েও তাহাই হইয়াছিল। মানবজাতির ধ্বংসের সূত্রপাত এই স্থানেই। ইউরোপে ফরাসীবিদ্রোহও ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যত দিন মনুষ্যপ্রকৃতিতে প্রলয় উপস্থিত না হইতেছে, তত দিন নাস্তিকবাদ কখনও জয়ী হইতে পারিবে না। মানব-জীবনে ধর্ম্ম এরূপ ওতঃপ্রোতঃভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মানবের সমুদয় মানসিক ও নৈতিক গঠনপ্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন না করিয়া ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করা যায় না। ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের লক্ষণ। ইহা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। এই জন্যই প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্ব, ধর্ম্মে যাহারা হীন তাহারা পশুর সমতুল্য।

২। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—বাস্তবিকই সকল শক্তির মূলে একটী অনন্ত শক্তি আছে। সকল শক্তিই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উৎসারিত হইতেছে। সেই শক্তিকে যদি তোমরা —ঈশ্বর—এই আখ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা প্রদান করিতে পার। কিন্তু সেই ঈশ্বর দুরবগাহ রহস্যের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। তিনি অজ্ঞাত ও অগম্য, কেহ তাঁহাকে জানে নাই এবং জানিতেও পারে না। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, যতই অন্বেষণ কর না কেন, তিনি তোমার চেষ্টার অতীত, তিনি তোমার অন্বেষণের পর পারে।

কিন্তু ইহা কি কখনও সম্ভবপর যে, মনুষ্য সেই অদ্বিতীয় প্রেমময় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার অন্বেষণে বিরত হইবে? নাস্তিকের যতই সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক উপস্থিত থাকুক না কেন, যুগে যুগে মানব ঈশ্বরের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেই থাকিবে। তুষারাবৃত হিমপ্রদেশস্থিত উত্তরমেরু আবিষ্কারের জন্য কত নাবিক তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিল, কত ভীষণ দুঃখের ভার মস্তকে গ্রহণ করিল, আর সামান্য নাস্তিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মানব ঈশ্বরচিন্তা হইতে বিরত হইবে—ইহা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য? এই অন্বেষণশীল আত্মা পরমাত্মার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইবে, ইহা কি কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

"ভুলায়েছ যারে প্রলোভনে,
সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে,
কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার?"—

বাস্তবিকই ইহা অতিশয় যথার্থ কথা।

৩। এক্ষণে তৃতীয় উত্তর। এই উত্তরটীই সকলের গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় এবং সকলকে বিচারপূর্ব্বক ইহার গ্রহণ বিষয়ে অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয়। তৃতীয় উত্তর এই যে—ঈশ্বর আছেন, এবং মানুষ ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও তাঁহাকে জ্ঞাত হয়।

আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যাইতেছি না। আমি নাস্তিকের যুক্তিখণ্ডনে প্রয়াসী নহি। কিন্তু মানব ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাঁহা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে কদাপি সক্ষম হয় না—এই বিশ্বাস করিয়া সরলভাবে তাঁহাকে কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতে একবার চেষ্টা করিব।

প্রকৃতি রাজ্যে ঈশ্বর।

মানব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রকৃতিরাজ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছে। এই প্রকৃতির মধ্যেই মনুষ্য সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই প্রকৃতির নানা বিচিত্র শক্তি মানবের প্রাণে বিভিন্ন দেব দেবীর ভাব জাগরিত করিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় মানবজাতি শিশুর ন্যায় অতিশয় সরলমতি ছিল—প্রত্যেক দ্রব্যই

তাহাদিগের নিকট প্রাণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। সূর্য্য একজন দেবতা, তিনি আকাশ-মার্গে প্রতিদিন তাঁহার রথ চালনা করিতেছেন। প্রত্যেক কৌতুক-প্রদ শিলাখণ্ডও তাহাদিগের দেবতা। অসামান্য কাষ্ঠফলক তাহাদিগের কোনও অশরীরী দেবাত্মার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপে মানবের চিন্তাতে গগনবিহারী অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও যাবতীয় পার্থিব পদার্থ অসংখ্য দেবদেবী বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। যদিও প্রকৃতিপূজা অন্ধ নীতিবিগর্হিত ও অতিশয় জঘন্য বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি জগতে ইহাই এক সময়ে শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে ক্রমে মানব-হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তাহাদের জীবন, শক্তি ও সামর্থ্য অপেক্ষা এক বৃহত্তর জীবন, শক্তি ও সামর্থ্য বিদ্যমান আছে ও তাহার নিকট তাহারা অধীনতা স্বীকার করিতে ও তাহার পূজা করিতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রকৃতিপূজার মধ্যে যে জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য মানবের হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহাকে সে প্রাপ্ত হয় নাই। বলিতে কি, মানব যখন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস্ স্থাপন করিল তখনও সে কেবল প্রকৃতির ঈশ্বরকে পূজা করিত, তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিত এবং তাহার নিকট ভীত ও শঙ্কিত হইত, কিন্তু কদাপি তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিত না। সে তাঁহার চরণতলে অবনত হইত, তাঁহার দাস হইয়া থাকিত, কিন্তু কদাপি তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিত না। বাস্তবিকই, প্রকৃতি সৌন্দর্য্য, শক্তি ও দয়ার আধার এক ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে, কিন্তু তৎসহকারে আবার মানবের দুর্ব্বলতার প্রতি তাঁহার নির্দ্দয়তা, তাহার পাপের প্রতি তাঁহার কঠোরভাব এবং তাহার প্রার্থনার প্রতি তাঁহার বধিরতা প্রকাশ করিয়া দেয়। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ এক শাসনকর্ত্তাকে প্রকটিত করে, কিন্তু ইহা সেই অনন্ত দয়াময় পিতাকে ব্যক্ত করে না।

ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বর।

অনেকে বলিবেন, কেন অপর একটী স্থানে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর আশ্চর্য্য-জনক প্রকাশ দেখিতে পাই! প্রকৃতি-রাজ্য অধ্যয়ন করিয়া তুমি যাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হও, বিশ্বের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল তদপেক্ষা অনেক অধিক ঈশ্বরতত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারে।

বাস্তবিকই ইহা অতিশয় সত্য কথা। জগতের বাহ্যিক নিয়মপ্রণালীর মধ্যে আমরা যেরূপে ঈশ্বরপ্রকাশ দর্শন করি, ইহাদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিকতর, উচ্চতর ও গভীরতর ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাই। বাইবেল গ্রন্থে তুমি মানবাত্মাকে অধ্যয়ন করিতে পার, এবং যখন তুমি জীবন্ত আত্মার নিকটে আগমন কর, তখনই তুমি ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হও। ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে অতিশয় মূল্যবান্ ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

জগতের মধ্যে বাইবেল এক মহাগ্রন্থ। ইহার প্রতি পত্রে ঈশ্বর-প্রেরণার বহ্নি উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ কি? ইহা মানবের ঈশ্বর অন্বেষণের ইতিহাস মাত্র। যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানবাত্মা কিরূপ ব্যাকুলভাবে— 'কোথায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারি?'— এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাই আমাদিগের নিকট প্রকাশ করে। কিরূপে মানবজাতি জগতের ভীতিপ্রদ শক্তিনিচয়ে সন্তোষ লাভ না করিয়া অনন্ত প্রেম এবং সেই অনন্ত পিতার আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই সাক্ষীরূপে ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিরূপে অপরাপর মানব ঈশ্বরের জন্য অন্বেষণ করিয়াছে, ইহা তাহাই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। কিন্তু আমরা যদি সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে বাসনা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আপনাপনি তজ্জন্য অন্বেষণ করিতে হইবে, আপনাপনি তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। মহাত্মা ডেবিডের প্রার্থনা সকল, ঈশার সঙ্গীতাবলী ও জবের (Job) সংগ্রাম ও সংশয়ের কাহিনী আমরা আপনারা কিরূপে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারি তাহাই বলিয়া দেয়। যদি কেহ বলেন, 'এই ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বিশ্ববিধাতার স্বলেখনীনিঃসৃত,' তথাপি পিপাসু আত্মা কখনই সেই বাণীতে প্রীত হইতে পারেন না। পরমেশ্বর সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি বলিয়াছিলেন তাহা মানবাত্মা জানিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু তিনি অদ্য আমাদিগকে কি বলিতেছেন, তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র। জীবন্ত ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশা, মুষা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাকুলাত্মার নিকট তিনি যেরূপ স্বতথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্যও তিনি আমাদিগের ব্যাকুলাত্মাকে স্বকীয় বাণী শ্রবণ করাইবেন। ব্যাকুলাত্মা অনন্ত জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিশ্বনিয়ন্তার সিংহাসন আত্মহৃদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—'হে প্রভো, তোমার বাণী শুনাও, তোমার দাস সে বাণী শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে'।

আমাদিগের কোনও প্রাণসম সখা যখন বিদেশে বাস করেন, তখন তাঁহার লেখনীবিনিঃসৃত পত্রসমূহ আমাদিগের নিকট কতই না মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন সেই বন্ধুবর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হয়েন, যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করি, যখন তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে থাকি, তখনকার সে আনন্দের কি সীমা আছে? যদ্যপি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ঈশ্বরের লেখনীপ্রসূতই হইয়া থাকে, তথাপি সেই সকলের অধ্যয়নাপেক্ষা একটী প্রকৃষ্টতর বস্তু আছে। সেই প্রকৃষ্টতর বস্তু জীবন্ত ঈশ্বরের স্পর্শলাভ, সেই ঐশী সত্তার স্পর্শ, এবং সেই

পরমাত্মার সহিত বিশ্রম্ভালাপ। এইজন্যই আমরা বুঝিতে পারি কিরূপে ধ্যাকুলাত্মা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া কাঁদিয়া উঠেন, "আহা, আমিও কি ঐ ঋষি,ভগবৎব্যাকুল মহাত্মাদিগের ন্যায় ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না?" তাঁহারা ত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "হায়! আমি যদি জানিতাম কোন্ স্থানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়?"

মহাজনদিগের মধ্যে ঈশ্বর।

কেহ কেহ বলেন, মহাজনদিগের মধ্যেই কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যেই, মানবাত্মার মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাদিগের কার্য্যাবলীর মধ্যেই, সেই অজ্ঞের পরমেশ্বরের পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা ভগবানের অবতার। তাঁহাদিগের এইরূপ বলিবার কারণ কি, তাহা একবার চিন্তা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, সেই মহাত্মাদিগের অকৃত্রিম প্রেম, অকপট করুণা, আশ্চর্য্যজনক শুদ্ধভাব এবং তাঁহাদিগের সত্যপরায়ণতা এই সকল ঐশ্বরিক গুণ। তাঁহাদিগকে অবতার বলিবার কারণ ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহাদিগের স্বভাবের আশ্চর্য্য মিলন। তাঁহারা তাঁহাদিগের গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নশীল থাকিতেন। তাঁহাদিগের মনুষ্যপ্রকৃতি, ঐশ্বরিক প্রকৃতির সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, সেই মহানন্দের মহোৎসবে তাঁহারা গাহিয়া উঠিয়াছিলেন, —'সোহহম্'—আমিই সেই ব্রহ্ম; I and my father are one'...আমি এবং আমার পিতা এক। এই জন্যই যখন অন্যান্য মানব তাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বর-প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন তাঁহারা স্বকীয় মার্গ তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মা খৃষ্ট বলিয়াছিলেন,—'Live such a life as I am living and you will find God as your father.'—আমার ন্যায় জীবন অতিবাহিত কর, তোমরাও তোমাদিগের পিতৃরূপে ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত হইবে।' I am the door,' 'I am the way'—আমি পিতৃভবনে যাইবার দ্বার, আমিই তাহার পন্থা। বাস্তবিকই ইহা অতিশয় সত্য কথা। যে ব্যক্তি পিতার ভবন দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তিই আগন্তুককে সেই গৃহে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। ইহাতে আত্মশ্লাঘা নাই। ইহা কর্ত্তব্যের আহ্বান। কিন্তু এই মহাজনগণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই মত বিশ্বাসে কেহ কখনও ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি তাঁহারাই পিতৃভবনের দ্বার হয়েন, তাহা হইলে কেবলমাত্র তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম ও পূজা করিয়া সন্তুষ্ট থাকা কোনও ক্রমে উচিত নহে। দ্বার দেখিয়াই যদি সন্তুষ্ট

হইয়া তাহার পূজায় জীবন অতিবাহিত করি, তবে মন্দিরে প্রবেশ করিব কিরূপে? তীর্থ পর্যাটন করিতে যাইলাম, প্রবেশের দ্বার দেখিলাম, দ্বারের পূজা করিয়া ফিরিলাম, মন্দিরের মধ্যে দেবতাকে দেখিলাম না! হায়রে মানব-জীবন!

আমার তীর্থের ফল হইল কি? ক্ষুদ্র মানবের দুর্গতি দেখিয়া মহাজনগণ আপনাদিগের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া, নিগূঢ় সত্য, মানবের মুক্তির সোপান আবিষ্কার করিলেন, মানবকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হতভাগ্য মানব তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিল, তাঁহাদিগকে ফলপুষ্পে পূজা করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে ফলপুষ্পে পূজা করিলে, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিলে, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক। এ স্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। (১) অকূল সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি, এরূপ সময়ে এক সন্তরণপটু ব্যক্তি ঘাটের পথ আমাকে দেখাইয়া দিল। আমি যদি ঘাটের পথে গমন না করিয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরি, তবে কি উভয়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয় না? (২) আমি কলিকাতা হইতে দিল্লি যাত্রা করিব। ষ্টেসনে গেলাম, দিল্লির পথ জানেন এরূপ এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট দিল্লিগমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বিদিত পন্থা বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, টিকিট ক্রয় কর, সম্মুখে যে বাষ্পীয় শকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাতে আরোহণ কর, তুমি অচিরে দিল্লি পৌছিবে। আমি তাঁহার নিকট, চিরকৃতজ্ঞ হইলাম, তাঁহাকে ধন্য-বাদ প্রদান করিলাম। কিন্তু টিকিট ক্রয় করা দূরে থাকুক, আমি তাঁহার চরণ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিলাম, তাঁহার নানা প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে ফলপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ট্রেনে উঠিলাম না। তাহা হইলে কি আমার দিল্লিগমন হইল? জ্ঞানিগণ আমাকে বিকৃতমস্তক বলিয়া হাসিতে হাসিতে দিল্লি প্রস্থান করিলেন।

অদ্য যদি সেই মহাত্মাগণ এই ধরাধামে তাঁহাদিগের পার্থিব শরীর অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকিতেন ও দেখিতেন শত শত নরনারী হৃদয়ের আবেগে তাঁহা-দিগকে পরম পিতা জগদীশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা কি আজ গভীর আত্মবেদনায় ক্রন্দন করিয়া বলিতেন না?—'হে শিষ্যবর্গ তোমরা কি করিতেছ? আমাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইও না, একবার মন্দিরে প্রবেশ কর। আমি যে দ্বার, আমি যে পন্থা, আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিও না। একবার জীবন্ত দেবতার মন্দিরে প্রবেশ কর, প্রেমময় অনন্ত পিতা তোমাদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিবেন।'

এই বিশ্বের মহাজনগণ ঐশ্বরিক গুণ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে আমাদিগের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকেও ঈশ্বরের গুণ লাভ করিয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। মন্দিরের দ্বার অতিশয় সৌন্দর্য্যময় হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র মন্দিরে, যে স্থানে ঈশ্বর সন্দর্শন লাভ করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, যেস্থানে প্রেমময়ের অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্তি লাভ করে, সেই পুণ্যময় স্থানে প্রবেশ হইতে আমাদিগকে আকৃষ্ট করা কদাপি ন্যায়সঙ্গত নহে।

মানবাত্মায় ঈশ্বর।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যেই সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

স্বকীয় আত্মার মধ্যেই কেবল মানব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য ঈশ্বরকে আপনার আত্মকোষের মধ্যে দর্শন করিতে না পারে, ততদিন সে তাঁহাকে কুত্রাপি দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যখন সে একবার তথায় তাঁহাকে দর্শন করে, তখন সে সর্ব্বত্র—মহাজনভিতরে, ধর্ম্মগ্রন্থনিচয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়, তাঁহার প্রকাশ দর্শন করে এবং প্রকৃতির ভীষণতাও তখন তাহার নিকট অনন্ত প্রেমময় পিতার প্রেমের শাসন বলিয়া উপলব্ধি হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলও এইরূপেই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন,

"জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—

'জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।' বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'Blessed are the pure in heart, for they shall see God.'—পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবেন। 'God is love; and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him.'—ঈশ্বর প্রেমময়; যিনি প্রেমেতে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরে বাস করেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে বাস করেন। এতদ্দ্বারা ইহা বলা হইতেছে না যে, ঈশ্বর বিষয়ে সমুদায় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, কিন্তু এইরূপে মানব আপন আত্মার অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার অত্যাবশ্যক জ্ঞানফল প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরবিষয়ক এই, যে জ্ঞান, মানব তাহার অভিজ্ঞতার দ্বারা, তাহার বহুদর্শিতার দ্বারা, লাভ করে, তাহা অতিশয় মূল্যবান। প্রত্যেকেই তাহার অধিকারে সমর্থ। ইহা কেবল সাধুদিগের নহে, ইহা কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা দার্শনিকের নহে, ইহা শ্রমজীবী কৃষকদিগের, ইহা শাস্ত-

ক্লান্ত অবলা রমণীগণের, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগেরও অধিকারের সামগ্রী। এই ধর্ম্মই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ সম্পত্তি। যে কোনও মানবের হৃদয় নির্ম্মল প্রেমে স্পন্দিত হয়, আত্মা বিমলতা লাভ করিবার জন্য নিরন্তর উন্মুখ, সেই ব্যক্তিই এই ধর্ম্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত। ইহা পৌরহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না, কিন্তু অধিকতর ঐশ্বরিক জীবন ও দেবত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র মানবদিগের সমান অধিকারের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করে। মহাজনগণ মানবজাতির এই সর্ব্বোচ্চ ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির এই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বজনীন ধর্ম্মই খৃষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন, যখন তিনি বলিয়াছিলেন 'Thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babies.'—(হে পিতঃ), তুমি এই সকল নিগূঢ়তত্ব বিজ্ঞ, জ্ঞানীদিগের নিকট লুকায়িত রাখিয়াছ, এবং শিশুদিগের নিকট তাহা প্রকাশিত করিয়াছ।" ঈশ্বরপ্রাপ্তির সরল মার্গ মানবহৃদয়। সত্য এবং প্রেমের প্রেরণা দ্বারা বিশোধিত এবং শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়ই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহা হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুক্ষ্মতম এই জ্ঞান লাভ করি যে ঈশ্বর-লাভের জন্য আমাদিগের প্রত্যেক অন্বেষণের মধ্যে, প্রেমময় পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা বলি মানব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ঐ মহাজনবাণীর প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা বলিতেছেন,—"যাঁহারা অকপট আত্মাতে, সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করিবে, প্রেমময় পিতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অন্বেষণ করিতেছেন। ভগবান্ যদি দুর্ব্বল মানবকে না চাহিতেন, তবে মানব কখনই তাঁহাকে চাহিতে পারিত না। মানব-প্রকৃতিতে ভগবানের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা এও ই ব্যাকুলতাই তাঁহার সত্তার এবং তাঁহার ব্যগ্রতার (পকৃষ্ট) প্রমাণ। তিনি যে কেবল ব্যাকুল প্রার্থনার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন তাহা নহে, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া মানবের প্রার্থনার ভাব উদ্দীপিত করেন। যখন ব্যাকুল আত্মা ক্রন্দন করিয়া উঠে, 'হায়রে যদি জানিতাম কোন স্থানে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়' তখন আমরা যেন নিশ্চিতরূপে জানি যে, ভগবান আর অধিক দূরে নহেন।

এক্ষণে, এই প্রবন্ধের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে :—

(১) আমরা সকলেই ঈশ্বর লাভের আবশ্যকতা বোধ করি।

(২) আমাদিগের জন্য আমরা আপনারাই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিব।

(৩) আমাদিগের উচ্চ প্রকৃতির মধ্যে, আমাদিগের আত্মার বিশুদ্ধির মধ্যে, আমাদিগের গভীর হৃদয়ের প্রেম ও চিত্তের সত্যের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিব।

(৪) সর্ব্বশেষে, আমরা এই তত্ত্বে উপনীত হইব যে, কৃপাময় হরি সর্ব্বদাই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন এবং আমাদিগকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। আমরা ভগবানকে ধরিয়াছি, কারণ তিনি আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের সমাজ।

আজ কাল "সমাজ-সংস্কার" "সমাজ-সংস্কার" বলিয়া একটা কথা শুনা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজের উন্নতি-কল্পে মনপ্রাণ সহযোগে কেহই অগ্রসর হন না। এই জন্যই "বাঙ্গালীর কেবল বাক্যাড়ম্বর মাত্র সার" বলিয়া একটা অপবাদ আছে। আমাদের বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ মুখে যাহা বলিয়া থাকেন, কার্য্যে ত তাহা করিতে সক্ষম হন না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী রাজনীতির পরিচর্চ্চা করিতেছেন, স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য ব্যগ্রতা জানাইতেছেন, কিন্তু হায়! আমাদের নিজেদের সমাজমধ্যে যে সকল অত্যাচার হইতেছে, যে সকল দোষ রহিয়াছে এবং যাহা স্বদেশবাসিগণ ইচ্ছা করিলেই দূরীভূত করিতে পারেন, সে বিষয়ে কেহই মনোযোগী নহেন। 'বাঙ্গালীর অনৈক্যই সকল অনিষ্টের মূল।'

আমাদের সমাজ-মধ্যে বাল্য-বিবাহ, বর-পণ, প্রভৃতি যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের অগ্রে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। নচেৎ আমাদের দেশের কখনও মঙ্গল সাধন হইবে না।

কন্যাদায়-গ্রস্ত হইয়া কত গৃহস্থ যে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর যদি কিঞ্চিন্মাত্র সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে কদাপি এপ্রকার ঘটিতে পারিত না। সকলকেই এক সময়ে না এক সময়ে কন্যাদায়ে বিব্রত হইতে হয়, কিন্তু পুত্রের বিবাহকালে তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইয়া যান এবং কন্যা-পক্ষের নিকট হইতে এত অধিক পণ চাহিয়া বসেন যে, তাহাতে নিজে কন্যার বিবাহে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার "সুদ সমেত" আদায় করিবার চেষ্টা করেন। এ সকল কি নির্ম্মমতা নহে? বাঙ্গালীর হৃদয়ে একতা ও সহানুভূতি থাকিলে কি এ প্রকার পৈশাচিক কার্য্য করিতে অভিলাষ হয়?

কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তি বরপণ প্রদান করিতে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, অথচ না দিলে কন্যার বিবাহ হয় না। অগত্যা তাঁহাকে ভিটা মাটি বিক্রয় করিয়াও বরকর্ত্তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয়।

দরিদ্র বঙ্গবাসীর ইহাতে যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতে-

ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাপি এ মোহ কেহই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত নহেন।

দ্বারভাঙ্গার জেলা-কোর্টের উকিল বাবু রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়, এ সম্বন্ধে একটি সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য-পুত্র বাবু মনোমোহন-দত্তের বিবাহে, তিনি পাত্রীপক্ষকে পীড়ন-পূর্ব্বক টাকা কড়ি কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি এ বিষয়ে যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছেন, আমাদের বঙ্গবাসী সকলেরই তাহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

বিবাহ মানব-জীবনের একটী প্রধান সংস্কার। সেই বিবাহ এখন যেন পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি যত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন, তিনি তদনুযায়ী সুপাত্র পাইবেন।

আধুনিক শিক্ষাভিমানী যুবকের অভিভাবকগণ কন্যাপক্ষের নিকট অত্যধিক অর্থ দাবি করিয়া বসেন—ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে?

পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিরাশিতে ভূষিত করা, কেবল কি কন্যাপক্ষের নিকট তাহাকে অধিক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য?

কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লোকে ইহাকে অপমানের পরিবর্ত্তে গৌরব বলিয়া মনে করে।

আবার এদিকে, কন্যা যদি একটু বয়ঃস্থা হইয়া পড়ে, সমাজ তাহাকে শত ধিক্কার দিবে। লোকের গঞ্জনায় কন্যার পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সমাজে মুখ দেখান ভার হয়। এ সকল আরও নিষ্ঠুরতার কার্য্য। এক দিকে বরকর্ত্তার টাকার পীড়ন ও অন্য দিকে সমাজের লাঞ্ছনা, এই দুই কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কত সময়ে কতজনে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এইজন্যই বাঙ্গালীর গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে বাঙ্গালী যেন কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

সমাজের এই সকল অত্যাচার নিবারণ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? পুরাণ ইতিহাসাদি দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে পুরাকালে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না।

যদিও সাধারণ লোকের মধ্যে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যে সকল রাজকুমারী স্বয়ম্বরা হইতেন, যৌবনপ্রাপ্ত হইবার পর তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে। ১০।১১ বৎসরের বালিকাগণ কখনও স্বয়ম্বরা হইবার উপযুক্তা নহে। ১০।১১ বৎসরের ছোট ছোট বালিকাগণ কি স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সমর্থা হয়?

বাল্য-বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। শাস্ত্রে যদি বাল্যবিবাহেরই নির্দ্দেশ থাকিত, তাহা হইলে সে কালের ধর্ম্মাত্মা আর্য্য রাজগণ শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া কখনই অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেন না। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ধন, এমন

কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি এই সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত শাস্ত্রোপদেশ অন্যথা করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেন? কখনই না। তবে দেখা যাইতেছে যে, কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশের লোকেরাই এই বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়াছেন, এবং বরপণ বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন নিজেরাই করিতেছেন।

যিনি ইহ জীবনের সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী, যিনি হিন্দুর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, জীবন বিচ্ছিন্ন হইলেও যাঁহার সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, সেই পত্নী গ্রহণকালে পত্নীর পিতৃকুলকে এরূপভাবে নিপীড়িত করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য?

স্নেহলতা ও নিভাননী প্রভৃতি বালিকার এ লোমহর্ষণ আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়াও কি আমাদের সমাজের চক্ষু উন্মিলিত হইবে না?

সরল বালিকাদ্বয়ের অকালে এ আত্মাহুতির জন্য দায়ী কে? আমাদের নিষ্ঠুর সমাজমধ্যে কি এমন কোন নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি নাই, যিনি এই পাশবিক উপায়ে অর্থ-গ্রহণ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বালিকাটীকে পুত্রবধূ-রূপে স্বগৃহে আনয়ন করেন? ছি ছি! ইহা কি লজ্জার কথা।

যে আর্য্যসন্তানগণ অক্লেশে রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতেন, আজি তাঁহাদেরই বংশ সম্ভূত সন্তানগণ সামান্য অর্থলোভ পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া বালিকা-হত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন।

ভগবান্ করুন, সমাজে আর যেন এরূপ নারীহত্যা না ঘটে। নিষ্ঠুর সমাজ যেন এই দেব বালাদ্বয়ের রক্ত পান করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। আমাদের সমাজের লোকে মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাউক। এ কুপ্রথা অচিরে আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হউক।

এই স্বর্গীয় দেববালাদ্বয় এরূপে আত্মাহুতি দিয়া সমাজকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, রমণীর কত সহিষ্ণুতা ও রমণীহৃদয়ে আজও কত অপ্রমেয় বল আছে।

নারী! শুধুই জগতের হেয়, অবজ্ঞেয়, অপদার্থ জীব নহে। রমণী ইচ্ছা করিলে আজও অসাধ্য সাধন করিতে পারে। অতএব এস ভগ্নীগণ! এস সমাজ হইতে এ কুপ্রথা দূর করিতে আমরা সচেষ্ট হই। এস, আমরা পণ করি আমাদের স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যাপক্ষকে পীড়নপূর্ব্বক কদাপি অর্থ গ্রহণ করিব না। আমরা সকলে একযোগে যদি এ কার্য্য করি, তবে অবশ্যই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। সরলা বালিকারা তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কোমল প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া জগৎসমক্ষে চিরদিনের জন্য আপনাদের মহত্ত্ব স্থাপন করিয়া গেল, আর আমরা কি সামান্য অর্থ লোভ

সংবরণ করিয়া জগতে একটু মনুষ্যত্ব দেখাইতে সক্ষম হইব না ? হায় ! সমাজের এই নিষ্ঠুরাচরণের জন্ত যাঁহারা আজ কন্তারত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণে কি নিদারুণ কষ্ট। আর যাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। এস ভগ্নীগণ আমরাই এ শুভকার্য্যে অগ্রসর হই। জগৎ দেখুক, রমণী দুর্ব্বল হইলেও অক্ষম নহে। আমরা আর্য্যরমণী, আমাদের কার্য্য দেখিয়া জগৎ তাহা প্রত্যক্ষ করুক। এস ভগ্নীগণ! এ কলঙ্ক দূর কর। নারীর ব্যথা নারী ভিন্ন কে বুঝিবে? স্নেহলতা ও নিস্তারিণীর পবিত্র রক্তে সমাজের এ কলঙ্ক ধৌত হইয়া যাউক।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

রাঁচি ভ্রমণ।

১৪ই মার্চ্চ শনিবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাঁচি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বহু দিবসের সাধ এক্ষণে পূর্ণ হইল। অনেক দিন হইতে আশা করিয়াছিলাম যে রাঁচি দর্শন করিব, ভগবানের ইচ্ছায় সে অভিলাষ পূর্ণ হইল। আমরা যখন গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব ছিল। গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দেখিলাম যে তথায় তিলমাত্র স্থান নাই। রমণীগণের মধুর কলধ্বনিতে গাড়ী মুখরিত হইতেছিল। আমরা যে উপবেশন করিতে পাইব তাহার কোনরূপ আশাই ছিল না। যাহা হউক প্রাণে এত উৎসাহ হইয়াছিল যে, তাহার মধ্যেই কোন রূপে স্থান করিয়া লইলাম। তৎপরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, প্রথমে মন্থর গতিতে ক্রমশঃ তীব্রবেগে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। সে দিন প্রতিপদ তিথি ছিল, সন্ধ্যার অল্লক্ষণ পরেই চন্দ্রমা গগনে উদিত হইয়া কোমল আলোকরাশিতে সমগ্র ধরণীকে ধৌত করিতেছিল। মনে হইল যেন ধরণী দেবী শুভ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা স্বীয় শরীরকে আবৃত করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে ধান্য-ক্ষেত্র। তাহার উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। কি নিস্তব্ধতা! অদূরে গ্রামের আলোক সকল দেখা যাইতেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এইরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। পরে গাড়ীর আরোহিগণ সকলেই যে যাহার শয়নের নিমিত্ত স্থান করিয়া লইলেন, আমি এক মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র, কত নদী অতিক্রম করিয়া ট্রেন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমশঃ নিশাকরের শুভ্রজ্যোতিঃ স্পষ্টরূপে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছিল।

এতক্ষণ সমগ্র গাড়ী মধুর হাস্যধ্বনিতে ও কলরবে পূর্ণ হইয়াছিল, একণে দেখিলাম সকলেই নিদ্রিত। রাত্রি বারটার সময় গাড়ী খড়্গাপুরে আসিয়া পৌছিল। সেই সময় আমি একবার গাড়ীর চতুর্দ্দিক দেখিয়া বুঝিলাম যে, শয়ন করিতে পারিব না। তখন সকলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কেহ কেহ নাসিকাধ্বনি দ্বারা সমগ্র গাড়ীখানি কম্পিত করিতেছিলেন। খড়্গাপুরে গাড়ী অনেক ক্ষণ থামিয়াছিল। অনেক যাত্রী আরোহণ করিলেন এবং অনেকে অবতরণ করিলেন। পান ও সিগারেট বিক্রেতা প্রভৃতি যে যার নিজ দ্রব্য উৎকৃষ্ট বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তৎপরে গাড়ী ছাড়িল, এবং পুনরায় তাহার বিশাল দেহ লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে ট্রেন অনেক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। ঐ সকল ষ্টেশনে গাড়ী এত অল্পক্ষণ থামিতে-ছিল যে, ভাল করিয়া ঐ সকল স্থানের নাম পড়িতে পারিতেছিলাম না। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত আসিল, তখন আমি একটু শয়ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে যিনি যাইতে-ছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আমায় নিদ্রা যাইতে বলিলেন। আমি একটু শয়ন করিলাম, তৎপরে অকস্মাৎ কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উত্থান করিয়া দেখি-লাম যে, গাড়ী আদ্রায় উপস্থিত হইয়াছে। আদ্রায় গাড়ী অতি প্রত্যূষে আসিয়া পৌঁছে। দেখিলাম সবে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে তরুণ অরুণ উদিত হইয়া স্বীয় সহস্র রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতেছে। বিহঙ্গের মধুর কাকলী ধ্বনিত হইতেছিল, এবং সুশীতল সমীরণ বহিতেছিল। পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দুসমূহ সূর্য্যের রশ্মিতে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। আদ্রা একটী প্রকাণ্ড ষ্টেশন, এস্থানে অনেক লোকের সমাগম দেখিলাম। তাহার বেশীর ভাগই হিন্দুস্থানী, কেহ কেহ তাহাদের বিশাল পাকড়ী, ভুঁড়ী ও লোটা লইয়াই ব্যস্ত। তৎপরে গাড়ী ছাড়িলে আমরা সকলে নিজ নিজ দ্রব্য ঠিক করিতে লাগিলাম, কারণ ইহার পরেই পুরুলিয়া, সেই স্থানে আমাদের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। রাঁচি অবধি ট্রেণের লাইন আছে; তৎ-পরে হাজারিবাগে যাইতে হইলে পুরপুরে যাইতে হয়। আমরা পুরুলিয়ায় অবতরণ করিলাম ও রাঁচির গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। রাঁচির গাড়ী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ভিতরে বসিবার অনেক বেঞ্চ আছে। গাড়ী যে সকল ষ্টেশনে থামিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ঝালদা নামক ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থামিল। এই ঝালদায় জল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত পাইপ আছে। নিকটে একটী নদী আছে, তাহা হইতে জল গ্রহণ করিয়া পাইপ দ্বারা নির্ম্মল করিয়া tankএ রাখা হয়। তৎপরে যাহা দেখিলাম, সে দৃশ্য

জীবনে ভুলিতে পারিব না। গাড়ী ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে লাগিল। উঃ কি ভীষণ অরণ্য, যতদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় কেবলই অরণ্য। তৎপরে পর্ব্বতশ্রেণী আরম্ভ হইল। এক ধারে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, অপর ধারে গভীর পিচ্ছিল খাদ। যদি কোনরূপে ট্রেণ একবার তাহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, তাহা হইলে সহস্র হাত দূরে ঐ ভীষণ খাদের মধ্যে পতিত হইয়া একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই অঞ্চল "জোন্নাহার জঙ্গল" বলিয়া বিখ্যাত। বাস্তবিক সেই ভীষণ অরণ্যের ভিতর দিয়া কোন রূপে বাটীতে পৌঁছিয়া আহারাদি করিলাম। যে বাটীতে ছিলাম সেইটী ঠিক রাঁচি সহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত ক্ষেত্র, পশ্চিম ধারেও ক্ষেত্র। উহার মধ্যে রাঁচি আদালত সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী বড় আদালত দেখিলাম, সেইখানে জজ্ ও মুন্সেফ বসেন। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী আদালত দেখিলাম। সেই ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে রাস্তা। বাটীর পশ্চিম দিক দিয়া কিছু দূর গমন করিলে Treasury House দেখা যায়। আর একটী নূতন Treasury House নির্ম্মিত হইতেছে, উহা আমাদের বাটীর এত নিকটে, যে জানালায় দণ্ডায়মান হইলে রাজমিস্ত্রীগণ কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাইতাম। ঐ বাটীটি শীঘ্র নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত রাত্রিতে অবধি মিস্ত্রীগণ কার্য্য করিত। তাহাদের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত রাত্রিতে ঐ স্থানটী আলোকিত করা হইত। তৎপরে লাট সাহেবের ভবন দেখিবার জিনিষ। ইহা একতালা বাটী, বিস্তীর্ণ উদ্যান। এই বাটীর সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা Pretoria Road নামে খ্যাত। এই রাস্তাটী রাঁচির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। লাট সাহেব তখন এখানে ছিলেন না, বাঁকীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা শুনিলাম তিনি শীঘ্রই আসিবেন। ইহার অনতিদূরে Staff quarters। এস্থানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ অবস্থান করেন। এই বাটী সমূহ সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত। তৎপরে জজ্ সাহেবের বাটী। আমাদের বাটীর নিকট দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে, তাহা Upper Bazar নামে খ্যাত। "লিচু বাজার" নামে বাজার সর্ব্বাপেক্ষা জনতাপূর্ণ ও প্রধান ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। ইহার নিকটেই প্রতি বুধ ও শনিবারে হাট বসে। তৎপরে Ranchi Office ও Ranchi Zilla School, এই দুইটী উল্লেখ যোগ্য। এই দুইটী পরস্পরের সম্মুখীন ভাবে অবস্থিত। Schoolএর প্রধান শিক্ষক সাহেব। এখানে অনেক গুলি ছাত্র অধ্যয়ন করে। শুনিলাম স্থানের সঙ্কুলান না হওয়াতে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। Post office এর গৃহ লাল ইট দ্বারা নির্ম্মিত। এস্থানে দুটার সময় ডাক যায় ও সেই সময়েই পত্রাদি বিলি হয়। এস্থানে পুস-পুসের চলন দেখিলাম। অধিবাসীগণ প্রায়ই কোল, বেহারী ও হিন্দুস্থানী ও দেখিলাম।

আজ কাল অনেক কোল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদের বাটীর উত্তর পশ্চিম কোণে "ডেপুটী মহল" অবস্থিত। এস্থানে ডেপুটীও সব ডেপুটীগণ অবস্থান করেন এই স্থানের উত্তর-পশ্চিম কোণে মোরাবাদী পাহাড় অবস্থিত। আমরা এক দিবস এই পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। গাড়ী, পুসপুস অথবা পদব্রজে সেখানে যাওয়া যায়। এই মোরাবাদী পাহাড়ের উপর শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের বাটী আছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুন্দর সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা উঠিয়া দেখিলাম ঠাকুর মহাশয়দের বাটীর প্রাচীর আরম্ভ হইয়াছে। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটু সমতল ভূমির উপর দেখিলাম ঠাকুরমহাশয়দের বাটী নির্ম্মিত। চতুর্দ্দিকে উদ্যান, সম্মুখে ফটক, প্রস্তরে "শান্তিধাম" নাম খোদিত আছে। তাহার পর ফলফুলে শোভিত রাস্তা গমন করিয়াছে। উহার নিকটেই একস্থানে উপবেশনের নিমিত্ত মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী নির্ম্মিত রহিয়াছে। তৎপরে ইঁহাদের বাটী দেখিলাম। ইহার পশ্চাৎভাগে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত একটী সুন্দর নিভৃত উদ্যান দেখিলাম। সেই স্থানটী কি সুন্দর, এমন রম্য যে তাহা বর্ণনাতীত। তৎপরে আমরা উহার শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। বরাবর সিঁড়ির ধাপ গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের নিমিত্ত মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী দেখিলাম। তৎপরে একেবারে শিখরদেশে আরোহণ করিলাম। সেখানে দেখিলাম একটী চাতাল, তদুপরি থাম, তাহার উপর ছাদ। বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদীকা আছে। এই স্থানে উপাসনাদি হয়। যিনি আচার্য্য তিনি এই চাতালের ভিতর বসেন, উহার ভিতর অনূন্য ৩০।৩৫ জন লোক বসিতে পারে। এতদ্ভিন্ন বহির্ভাগে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদী আছে। এই স্থানে আগমন করিলে কি যে ভক্তি রসে মন আপ্লুত হয়, তাহা অবর্ণনীয়। সেই নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি এই মনোহর স্থানে যদি মহাপাপীও গমন করে, তাহারও মন অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিচলিত হইবে। সেই স্থানে আমার আত্মীয়া উপাসনা করিলেন। ইহার ভিতর একটি lantern ঝুলান আছে, রাত্রিতে ইহা জ্বালান হয়। পর্ব্বতোপরিস্থ এই আলো দূর হইতে দেখা যায়। তৎপরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করিলাম। সেই স্থানে একটী বংশদণ্ড রোপিত আছে তাহার উচ্চভাগে নিশান ও "ওঁকার" লেখা আছে। তৎপরে উহার একটু নিম্নে অবতরণ করিলে একটী গুহা দেখা যায়, সেস্থানে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আছে। এস্থানে গীতা পাঠ হয়। তৎপরে ঐ গুহার পশ্চাৎভাগে একটি কুঞ্জবন আছে। তাহার চতুর্দ্দিক লতা পাতা দ্বারা বেষ্টিত। উহার ভিতর গমন করিলে কেমন একটি সুমিষ্ট গন্ধ অনুভব করা যায়, তথায় পবন মৃদু মৃদু গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই

একটা রাস্তা গমন করিয়াছে। অবশ্য তাহাতে সোপানশ্রেণী নাই। এই স্থানে অনেকক্ষণ অবস্থান করিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলাম। ক্রমশঃ

কুমারী মনিকা বালা রায় চৌধুরী।

ফুল।

ফুলটি কেমন দেখ্‌তে ভাল,
যখন গাছে রয়,
দু'দিন পরে শুকিয়ে গেলে—
সেরূপ আর নয়।
পাতা সব তা'র ঝরে ঝরে
ভূতলশায়ী হয়!
রূপের শোভা ক'দিন তাই,
সকলি হয় লয়।
মধুর-ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে,
মধুপ ভগ্নমন।
প্রজাপতি আর নাহি আসে,
করিবারে নর্ত্তন।
রবির আলোতে চিকন ভাল,
দেখ্‌তে হ'ত ফুল,
গাছের সম্পদ ছিল যখন,
সুসমায় অতুল।
ফুলের সঙ্গেই সকল গেছে—
গাছের শোভা চলে,
এরূপ প্রকার সকল ঘটে,
নরের ধরাতলে।

শ্রীভু, মো, ঘো।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এল্‌. টি ও বি. টি, পরীক্ষার ফল—বিগত মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত এল্‌, টি ও বি টি, পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এল্‌. টী, পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

গায়কড কনকলতা লভডে—ডাওসেশন কলেজ্‌। ইনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পাশ।

(ইংরাজি বর্ণ মালানুসারে)

বিশ্বাস, সুষমা—ডাওসেশন্ কলেজ্‌।
ঘোষ মেরী—লরেটো হাউস্‌।
ঘোষ্‌ মুক্ত প্রভ—ডাওসেশন্ কলেজ্‌।

বি, টি পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

(গুণানুসারে)

বসু চৈলা—ডাওসেশন কলেজ্‌।
ল্যাংলি ইনেজ্‌—নন্ কলিজিয়েট্‌।
লিউইস্ ডরোথিয়া ইলিয়েনর্‌—নন্ কলিজিয়েট্‌।
লডরে জোয়ান্না—নন্ কলিজিয়েট্‌।

ইহারা যথাক্রমে সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশ ও একবিংশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পাশ।

(ইংরাজি বর্ণমালানুসারে)

বাগ্‌চি সুশীলা বালা—ডাওসেশন্ কলেজ। ও ভডে মার্গারেট লবঙ্গলতা—ঐ রাহ৷ ক্লেরিস্ গার্টুড—ডাওসেশন্ কলেজ্। দিন দিন রমণীগণের উন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছে।

দান—হুগলি জেলার অন্তর্গত উত্তর পাড়ার জমিদার রায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর হাওড়ার জেনারেল্ হাঁসপাতালে ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ডের (Indian ward, রোগী সেবিকাগণের বাসাবাটী নির্ম্মাণার্থ ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান প্রশংসনীয়।

কালা বোবা চোর—সম্প্রতি কলিকাতায় গঙ্গা নামক এক কালা বোবা চোর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগ এই যে গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে সে ১৬নং পটোয়ার বাগানে এক স্বর্ণকারের দোকানে চুরি করিয়াছিল। কলিকাতার কালা বোবা ইস্কুলের (Deaf and Dumb School) প্রিন্সিপ্যাল (Principal) শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কালা বোবা আসামীর সঙ্কেত মূলক এজাহার আদালতকে ও সাক্ষীর এজাহার সঙ্কেতে কালা বোবা আসামীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বিচারে আসামীর তিন মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। লোকে বলে বোবার শত্রু নাই, অর্থাৎ যে বোবা সে কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলিতে পারে না, সুতরাং কেহই তাহার শত্রু হইতে পারে না। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলের প্রভাবে আজ এই বেচারার কি দুর্দ্দশা ঘটিল।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল্ মহাশয় আদেশ করিয়াছেন যে কলিকাতা সহরের কোনও বাটীতে বা স্থানে চটের থলে মজুত রাখিলে বা গাঁট বাঁধা কল করিলে, সেই সকল বাটী ও স্থান গুদাম বলিয়া পরিগণিত হইয়া লাইসেন্স প্রাপ্ত গুদামের ক্রিয়াধীন হইবে। ফায়ার ব্রিগেড্ একট্ (Fire Brigade Act) ও এই সকল স্থানে প্রচলিত হইবে।

২। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ভারতবর্ষের ষ্টেট্‌সেক্রেটারী মহাশয় আদেশ করিয়াছেন যে ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল্ সর্‌ভিস্ (Indian Medical Service) হইতে নির্ব্বাচিত অফিঃ ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনারগণ অর্থাৎ সরকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ অতঃপর পূর্ব্বের মাসিক ১৭৫ টাকা বেতনের স্থানে মাসিক ২৫০ (আড়াই শত টাকা) বেতন প্রাপ্ত হইবেন। এবং গ্রীষ্মকালে

কোনও শৈল শীতাবাসে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে পারিবেন। এই সময় কর্ম্মোপলক্ষে অন্য স্থানে যাইতে হইলে তাঁহারা স্পেশাল্ কন্‌সেশন্ (Special concession) এবং ভ্রমণ ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত পরীক্ষা পরিদর্শনাদির জন্য তাঁহারা এক একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।
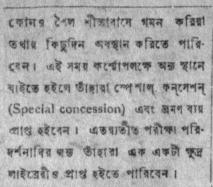
৩। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে সম্প্রতি বিহার গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে রাঁচি সহরের সরকারী মহল্লার সমগ্র ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারিদিগের বাটীতে কোনও নূতন ব্যক্তি আসিলে ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাহার নাম, পরিচয় এবং অন্যান্য বিবরণ আফিসের অধ্যক্ষের নিকট লিখিয়া দিয়া আসিবেন। ইহার অন্যথা করিলে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। আফিসের অধ্যক্ষ এরূপ নবাগত ব্যক্তিকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া যদি যুক্তি সঙ্গত মনে না করেন তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বাটী হইতে অবিলম্বে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীকে আদেশ করিতে পারিবেন। এই আদেশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিপালিত না হইলে আশ্রয় দাতা কর্ম্মচ্যুত হইবেন।

বামারচনা।

মাতৃদেবী।

স্নেহময়ি মাতঃ সাধ্বি গুণবতি
অপার তোমার স্নেহের ভারতী
স্মরিয়া নিয়ত মম ক্ষুদ্র মতি
বিপুল-পুলক-উচ্ছাসে ভাসে।
ও মুখের শান্ত সুমধুর ভাবে,
অধরের স্নিগ্ধ সুধাময় হাসে
প্রীতি শুক-তারা হৃদে পরকাশে
অশান্তি বিষাদ যাতনা নাশে। ১

দেবি! তোমা সম নিরুপম স্নেহ,
বিশাল ধরায় বিতরিতে কেহ
পারে না কো কভু, এ হৃদয় দেহ
পরিপুষ্ট তব অতুল স্নেহে।
পড়েছিনু যবে দীন পঙ্গু বেশে
অজানা অচেনা এ ভূতল দেশে,
তুমিই তখন স্নেহোচ্ছাসে ভেসে
নিয়াছিলে অঙ্কে সে জড়-দেহে। ২

লয়ে শিবময় নব নব আশা,
ঢেলে প্রাণভরা স্নেহ ভালবাসা
নিবারিয়া ছিলে শৈশব-পিপাসা
হৃদি পয়োধির পীযুষ দানে?
রেখে আমাপরে—চারু দুটি আঁখি
রাখিতে সতত অমঙ্গল ঢাকি,
না কাঁদিতে আহা বুকে করে রাখি
করিতে গো সান্ত্বনা আকুল প্রাণে। ৩
আগেত বুঝিনে কি স্নেহ অতুল,
অমরায় যার নাহি মিছে তুল,

কি স্নেহ পাথার অনন্ত অকুল,
জননী-মরমে সতত রাজে!
ত্রিদশ-কুসুম জীবন-জীবন
জীবন-তরুতে ফুটি পুত্র ধন
প্রদানিল মোরে সে জ্ঞান-রতন
ঢালি সেই স্নেহ হৃদয় মাঝে। ৪
পক্ষিনীর সম করি আবরণ
স্নেহ-পক্ষ পুটে,—করেছ পালন,
করেছ মা কত নিশা জাগরণ
কত আবদার সয়েছ নিতি।
হাসিতে হাসিতে অতলের জলে
স্বার্থ বিসর্জ্জন করি কুতুহলে
অসীম স্নেহের কুহকের বলে
সাধিয়াছ মোর আরাম প্রীতি। ৫
কিশোর কালেতে মধুর বচনে
মুদ্রিয়াছ নীতি-উপদেশ মনে,
সাজায়ে দিয়েছ বিদ্যার ভূষণে
হওনি কুণ্ঠিত অর্থ বায়ে।
শুভে সুমঙ্গলে উলসিত মন
দুঃখে ক্লেশে সম বিষাদে মগন
রোগে কাতরতা দেয় দরশন
স্নেহার্দ্র সরল নয়নদ্বয়ে। ৬
শিব-আকাঙ্ক্ষিনী জগত-মাঝার
তোমা হেন দেবি! কোথা পাব আর?
এ সংসার মাঝে তুমি মা, আমার
সতত শীতল শান্তির বারি।
পরম দয়াল বিভুর চরণে
এ মিনতি মাতঃ করি এক মনে
ও স্নেহ ছায়ায় ভরি আজীবনে
যেন মা পরাণ জুড়াতে পারি। ৭
গিয়াছেন পিতা, যাইবার তরে
করিছ তপস্যা তুমি প্রাণ ভরে
কে জানে কখন (তাই ভয় করে)
পলাবে কাটিয়া স্নেহের ডোর।
এর (ই) মধ্যে তব হয়েছে কি দশা
নাহি কোনও সাধ অভিনব আশা
হারায়ে সে মণি হারায়েছ দিশা
স্বপ্নেও লাগে না উষার ঘোর। ৮
সে দিনও ছিলে মা যেন রাজ রাণী
অকাল বৈধব্যে এবে তপস্বিনী!
পূত ব্রহ্মচর্য্যে করেছ সঙ্গিনী,
পতিপদ চিন্তা করেছ সার।
স্বরগেতে পিতা যোগাসনে বসি
করিছেন ধ্যান ঈশ-রূপ-শশী,
ভাতিছে তথায় তব প্রেম-রশ্মি
উজলি চরণ-সরোজ তাঁর। ৯

শ্রীমতি ক্ষীরোদ কুমারী (ঘোষ) দাসী।

---

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃকমুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

কবি মানকুমারী বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 610. June, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১০ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। জুন, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সুর বাঁধা।

বহু ভাবে ভাবি আমি
বহু-মাঝে ধাই,
বহুকে ধরিতে গিয়া
সবারে হারাই।
নাহি জানি একে মন
হইলে অটল,
এক-মাঝে বহু সাজে
পাইব সকল।
জীবনের সুর যদি
একে বাঁধা রয়,
জানিও জীবন কভু
না হইবে ক্ষয়।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী
বোলপুর।

শিশু জীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

ফ্রোবেলের ধারা মতে শিশুশিক্ষা।

১

বিখ্যাত জর্ম্মণ-পণ্ডিত মহাত্মা ফ্রোবেল শিশুস্বভাব উত্তমরূপে বুঝিয়া শিশুদিগকে সামান্য বস্তুর দ্বারা শিক্ষা দিবার রীতি প্রথম প্রচার করেন ও উহা কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ফরাসী ও জর্ম্মণ দার্শনিক রুসো ও পেষ্টেলোজি ইউরোপীয় পুরাতন ধারামতে অসম্পূর্ণ ও অনিষ্টকারী শিশু-শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রোবেলই প্রথম ঐ পুরাতন রীতি-নীতি ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের ও নিজের জ্ঞানের দ্বারা জর্ম্মনীতে প্রকৃত

শিশু-শিক্ষার জন্য ঐ নূতন প্রথা প্রচার করেন ও বালকবালিকাদিগের নিমিত্ত নিজেই স্কুল স্থাপন করেন।

শিশুর জন্মের সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয় সকল খুলিয়া যায় ও সে বহির্জগতের সকল বিষয়ের আভাস ও ধারণা প্রাপ্ত হয়। ঐ নূতন ভাবগুলির ক্রমে পুষ্টি সাধন করিয়া উহাদিগকে মানসিক জ্ঞানের অবস্থায় আনা ফ্রোবেলের প্রধান লক্ষ্য। ঐ কার্য্যে তিনিই এ জগতে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,—রুসো পুরাতন শিশুশিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণ বালকবালিকাদের প্রকৃত শিক্ষায় আমাদের দেশের ত কথাই নাই, ইউরোপেরও প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত অবহেলা দেখা যায়। ঐরূপ শিক্ষায় কেবল মস্তিষ্কের অনুশীলন হয়, কিন্তু শরীরের সামান্য ইন্দ্রিয়-সকল, মনোবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তিগুলি এরূপ অপরিপুষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে যে, প্রাপ্ত বয়সেও লোকে কোন অন্ধকার গৃহে একা থাকিলে বা গুপ্ত শব্দাদি শুনিলে ভয়ে উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইয়া অজ্ঞান শিশুর মত একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। নাক, কান ও ত্বকাদি উপযুক্ত চালনা দ্বারা যে কত পরিপুষ্ট হয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবের কত ক্ষতিপূরণ করে, তাহা আমরা অন্ধদিগের জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি। খেলার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, রুসো তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। মহাত্মা ফ্রোবেল চারিদিকের ঐ সকল স্বাভাবিক সংকেত বুঝিয়া জীবনারম্ভ হইতেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হন। দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শ—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান, সুশ্রাব্য ও মধুর শব্দ—এ সমস্তই তাঁহার শিক্ষার ধারার মধ্যে উচ্চস্থান পাইয়াছে। শিশুর দোলার ভিতরে তা'র মুখের উপর কোন উজ্জ্বল বর্ণের একটা গোলা বা ঝুমঝুমি বাঁধিয়া রাখিলে তা'র মনে রং ও আকৃতির জ্ঞান সঞ্চার হয়। ক্রমে শিশুর ধরিতে পারিবার বয়স হইলে, উহা হাতে, করিয়া সে স্পর্শ-জ্ঞান অনুভব করিতে পারে।

একটা নরম গোলা সমস্ত দিন শিশুর মাথার কাছে টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহার মনে একটা সম্পূর্ণ বস্তুর আকারের দাগ বসে। ক্রমে ঐ গোলাটা একটু একটু নাড়িলে ও তার সঙ্গে মা তালে তালে মিষ্ট গান গাহিলে শিশুর মনে গতি ও শব্দ জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ক্রমে শিশু ভিন্ন ভিন্ন গোলার দ্বারা পৃথক পৃথক রঙ্গে অভ্যস্ত হয়। ফ্রোবেলের মতে ঐরূপে অজ্ঞাতসারে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা তাহার পুষ্টি সাধন কালে চিরকাল মনে বসিয়া থাকে। শিশুর বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ গোলা খেলাও নানারূপে সাধিত হয়। কার্য্যকরী নবজাত শিশুর প্রথম বৃত্তি। ঐ বৃত্তির দ্বারা ফ্রোবেল সকলের পূর্ব্বে শিক্ষা কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা করেন। আরম্ভকালে শিশুর সকল কাজ অবাধে চলিতে দেওয়া

উচিত ; পরে উহা সোজা দিকে চালিত ও কষিত হওয়া আবশ্যক।

ফ্রোবেল অতি গভীররূপে স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ ও উহার নিয়ম সকল আবিস্কার করেন। বীজের মধ্যে যেমন গাছের অঙ্কুর ঢাকা থাকে, এবং তাহা হইতে সময়ে ডাল, পালা, পাতা ও শিকড়-যুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষ আবির্ভূত হয় ; ডিমের ভিতর যেমন জীবন-বীজ লুকান থাকে, এবং যাহা হইতে সময়ে পাখী ও উহার যত আশ্চর্য্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গতি বিধির যন্ত্রাদি পরিপুষ্ট হয় ; পাথর যেমন তার আরম্ভকালে যে স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা ভিন্ন কখন আর কোন আকার গ্রহণ করিতে পারে না ; প্রত্যেক জীব যেমন অনন্ত বিধানানুসারে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয় ও যে নিয়মের বিপরীত দিকে যাইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও সাধ্য নাই—মানবস্বভাবও সেই নিয়মের অধীন। এখন ঐ বিধান কি তাহাই আমাদের শিক্ষা করা উচিত। ফ্রোবেলের পূর্ব্বগামী অনেক বিজ্ঞ লোক উহার নানারূপ ধারণা ও অন্বেষণ করিলেও ফ্রোবেল ভিন্ন আর কেহই উহা বুঝিতে সক্ষম হন নাই। সেজন্য এখন তাঁহার পরিশ্রম ও জ্ঞানের বলে আমরা এত দিনে প্রকৃত শিশু-শিক্ষার যে মহা উপায় পাইয়াছি, তাহা যেন কোন জননী অবহেলা করিয়া শিশুর জন্ম হইতে চিরকাল তাহার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি সাধন করিতে বিমুখ না হন, এই আমাদের প্রার্থনা।

২

ফ্রোবেল শিশুর প্রথম কয়েক মাসের জন্য গোলা ও মাতার গানের দ্বারা যেরূপ শিক্ষা দিতে বলেন, তাহা আমাদের দেশের ঝুমঝুমি ও মা'র ঘুম পাড়ান গানের দ্বারা অনেকটা হইয়া থাকে। কিন্তু তার পরে শিশুর মন ও শরীর যত বাড়িতে থাকে জননীদিগের অল্প বয়স, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ ভারতীয় সন্তানেরা প্রকৃত শিক্ষায় বঞ্চিত হয়।

মনে যাহা কিছু প্রবেশ করে সে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা মনের উপর আধিপত্য করে। ঐ ধারণা অবলম্বন করিয়া ফ্রোবেল তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মূল স্থাপন করেন। যেমন যুবকেরা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীতও নিজেদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের ঠিক ব্যবহার করিতে পারে, শিশুগণ ও সেই রূপ অজ্ঞাত ভাবে ইন্দ্রিয় সকল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ব্যবহার শিখে, বিজ্ঞান আমাদিগকে কেবল পৃথিবীর ও সমুদয় বিশ্বের মধ্যে বৃদ্ধি, স্থিতি ও হ্রাসের স্বাভাবিক নিয়ম সকল শিক্ষা দেয়।

যদি কখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে জগতের সৃষ্টি কৌশল বুঝিতে না পারি, যদ্যপি উহা চিরকালের জন্য আমাদের কাছে রহস্য স্বরূপ থাকে, তথাপি চর্চ্চা ও অনুশীলন দ্বারা আমরা স্বাভাবিক শক্তির উপর মহা ক্ষমতা পরিচালন করিবার জ্ঞান লাভ করি। সকলেই জানেন, এক সময়ে জল ও আগুন এই দুইটি ভূতকে

লোকে কত ভয় করিত, কিন্তু এখন বিজ্ঞান বলে উহারা মানুষের যে কিরূপ বশীভূত ভৃত্য স্বরূপ হইয়াছে তাহা আমরা ধোঁয়া কলের অদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা দেখিতে পাই। অবশ্য বীজ ব্যতিরেকে বৃক্ষ সৃজন করিতে মানুষের সাধ্য নাই, কিন্তু বৃক্ষ জীবনের জ্ঞানের দ্বারা মানুষ প্রত্যেক গাছেরই উন্নতি সাধন করিতে পারে। আর এমন কি, পশু জীবনও মানুষের বৈজ্ঞানিক যত্ন ও চর্চ্চার দ্বারা উন্নত হইয়া থাকে। বৃক্ষ রোপণ বা উৎপাদন ও জমি শুদ্ধ করার জন্য বাতাস ও মেঘ অনেকটা মানুষের বশীভূত হয়। যে শক্তির দ্বারা অদ্ভুত বিদ্যুতের উৎপত্তি, এখন সেই শক্তি আমাদের দূত স্বরূপ হইয়া প্রতি দেশে ও নগরে সমগ্র জগতে সংবাদ দিতেছে। তবে শুধু কি মানুষের মন মানবজাতির অন্বেষণের কাছে দুর্গম থাকিবে? উহার নিয়ম সকল কি শারীরিক বিধানের উপর একান্ত নির্ভর করে না? আমরা নিশ্চয় বিশ্ব জগতের জ্ঞান ও অনুশীলন দ্বারা ঐ উন্নত জীবকে আরও অধিক সুন্দর ও মহৎ করিতে পারি।

কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম সকলের অজ্ঞতা ও বিকৃতি বশতঃ ঐ প্রকৃত শিক্ষার বিজ্ঞান অন্যান্য অনেক মহা উপকারী বিজ্ঞানের ন্যায় অবহেলার জন্য নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। সেজন্য আমাদের দেশের পিতা মাতাদিগকে ঐ মহৎ জ্ঞানের উপযোগিতা বুঝাইতে ও তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে ঐ জ্ঞানানুসারে পালন করাইতে আমাদিগের অনেক পরিশ্রম ও যত্নের আবশ্যক। ফ্রোবেল যখন প্রথম তাঁহার শিক্ষার ধারা জর্ম্মনীতে প্রচার করেন, তিনি তাঁহার কর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া সকল ইউরোপীয় জননীদিগকে তাঁহার সহায় হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের ভারতবর্ষে ঐরূপ উন্নত ও প্রকৃত শিশুশিক্ষার ধারা প্রচলিত করিবার সময় আমরা উচ্চৈঃস্বরে ভারতীয় জননীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। হাজার শিক্ষিত লোকদিগকে ঐ মহা শিক্ষার কথা বুঝাইলে যে উপকার না হইবে, একজন জননীকে অনায়াসে উহা বুঝাইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহা হইতে অনেক অধিক সুফল দেখাইতে পারা যাইবে। শিশু মাতার প্রাণের ধন, সেই কোমল শিশুকে শিখাইতে হইলে মা ব্যতীত আর কে উহাতে অধিক মনোযোগী ও অধিক সফল হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শিশু মাতৃপ্রেম ও মাতার স্বভাব অনুভব করে। ঐ প্রেম ধীরে ধীরে শিশুর আধ-ঘুমন্ত আত্মায় প্রবেশ করে। মা বুকে করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান, অতি যত্নে তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া রাখেন, আবার জাগিবামাত্র তাহাকে বুকে করিয়া দুধ দেন। এই রূপে জননীর ঐ আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ শিশুর আত্মায় প্রবেশ করিয়া পবিত্র মহৎ ও উন্নত মানব চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে। মাতার ঐ স্নেহময় গান সকল সতত যেন শিশুর সঙ্গে ঘুরিয়া

বেড়ায়। কানে সর্ব্বদা ঐ মিষ্ট শব্দ শুনিতে শুনিতে ও চক্ষে সতত ঐ প্রেমময়ী মাতার প্রেমের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শিশু আধ-ঘুমন্ত আত্মা স্বর্গীয় ভাবে জাগিয়া উঠে।

শারীরিক পুষ্টি সাধনের জন্য ও ক্রোবেলের ধারা উপকারী। ক্রমে মাতার গান শুনিতে শুনিতে শিশু যত বড় হইতে থাকে ও চলিতে শিখে, অমনি ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে খেলিতে শিখানও আবশ্যক। কি প্রকার গান, ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিশুর পক্ষে আনন্দদায়ক ও উপকারী, তাহা আমরা (কিণ্ডারগার্টেনে) দেখাইব। এই কোমল বয়সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যখন অতি নমনীয় থাকে, সেই সময় উপযুক্ত ব্যায়াম ও শরীরের চালনাদ্বারা প্রত্যেক ভাগের পুষ্টিসাধন করা অতি আবশ্যক।

ক্রীড়াই শিশুর প্রথম ইচ্ছা ও কাজ। সুতরাং খেলা দ্বারা শিশুর শরীর পুষ্টকরা ও মন প্রশস্ত করার মত ঔষধ আর নাই। নিয়মিতরূপে নানাপ্রকার ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির দ্বারা শিশুর শরীর ও মন উভয়ই এক ভাবে চালিত হয়, উহা শিশুকে সকল বাহ্যিক দ্রব্যের আকার, প্রকার ও কাজের শৃঙ্খলা শিখায়, শিশুর শরীরকে দৃঢ় ও সবল করে, শিশুকে ভবিষ্যতের বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করে।

ক্যানেডা প্রবাসীর পত্র।

O. A. C.
Guelph. Out.
Canada.
4th August, 1908.

শ্রীচরণেষু—

মা! যদিও এবার আমার আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি খাওয়া ঘটিল না, তাহার পরিবর্ত্তে কত নূতন নূতন ফল এদেশে খাইতেছি। সেইগুলির বিষয় একটু লিখি :—

১। Raspberry—দেখিতে প্রায় লিচুর মত লাল ও লিচুর চেয়ে ছোট, খোসা ছাড়াইতে হয় না, ভিতরে একটা দুটী করিয়া ক্ষুদ্র বিচি, মিষ্ট প্রায় লিচুরই মত। মেয়েরা একটা বড় কাচের পাত্রে করিয়া টেবিলের উপর দিয়া যায়। আমরা দশজনে মিলিয়া তাহা ভাগ করিয়া খাই। প্রত্যেকে এক একটি ছোট dish পূর্ণ করিয়া ঐ ফল লইয়া থাকি। তাহাতে একটু দুধ ও চিনি দিয়া চামচে করিয়া তুলিয়া খাই। অতি সুন্দর লাগে।

২। Blue berry—ফলসার মত বড়, পাকিলে উহার রং নীল হয়, মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বিচি থাকে। মেয়েরা যখন রস

নিংড়াইয়া দেয় তখন সে রসের রং একেবারে নীল। প্রত্যেককে এক এক গ্লাস পূর্ণ করিয়া পান করিবার জন্ত দিয়া যায়। আবার কখন কখন প্রত্যেককে ছোট কাচের বাটি করিয়া ঐ ফল দিয়া যায়, আমরা তাহাতে একটু দুধ ও white sugar মিশাইয়া খাই, কিন্তু কিছুতেই ঐ নীল রংটা যায় না। একেত ফলটা খুব মিষ্ট, তাহাকে আরো "গুড় গোলা" করিয়া খাওয়া হয়। এদেশের ছেলে মেয়েরা আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের ও বুড়োদের অপেক্ষা বেশী মিষ্টি খায়। সেজন্ম ২৫ বৎসর বয়স হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবক ও যুবতীদের মধ্যে দেখি যে একটা দুটা করিয়া false teeth মুখের মধ্যে বাঁধান আছে। অনেক ছেলে মেয়েরা আমার দাঁত দেখিয়া হিংসা করে ও জিজ্ঞাসা করে " সিংহ! তোমার দাঁত যে এখন সব গোটা "! আমি তদুত্তরে বলিলাম—"আমি ত বাঙ্গালাদেশে তোমাদের মত বেশী মিষ্টি খেতাম না, তাছাড়া আমি প্রত্যেক আহারের পর অন্ত ঘরে গিয়া মুখ ধুইয়া থাকি। তোমরা ত জলের অভাবে রুমালে মুখ মুছিয়া থাক।"

আবার আর একদিন দেখি যে পাক ঘরের মেয়েরা ঐ Blue berryর পিষ্টক করে এনে টেবিলেতে রেখেছে। এক খানি রেকাবে ময়দা গুলিয়া ও ইহাকে আর একটি ভিন্ন রেকাবে একপুরু করিয়া লেপিয়া, তাহার উপর ঐ সুপক নীল ফল বা তাহার রসে অৰ্দ্ধ ইঞ্চি পুরু করিয়া আবার তাহার উপর আর এক পুরু ময়দা গুলিয়া লেপিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কলের উননে চর্ব্বি দিয়া সেঁকিয়া লওয়া হয়। এ দেশে ত ঘি পাওয়া যায় না—কাজে কাজেই চর্ব্বি দিতে হয়। ঐ পিষ্টক খাইতে অতি সুন্দর লাগে।

এদেশের মেয়েরা ঐ প্রকার পিষ্টক লেবু, কলা, আপেল, খেজুর, কিসমিস, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি ফলের করিয়া থাকে। আমি মিস্ হার্ডিকে (ইঁনি আমাদের matron) বলিব যে ঐ সমস্ত পিষ্টক কি করে এ দেশের মেয়েরা প্রস্তুত করে তাহা আমাকে শিখাইতে। দেশে ফিরিলে আপনাদিগকে তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইব।

জেনে রাখিবেন এখানে যাহা কিছু রান্না হয় তাহা সব machineএতে (অর্থাৎ কলের উননেতে)। এদেশের মেয়েরা সমস্ত বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। তাহারা কি হাত দিয়া কাঠের বা কয়লার উননে রান্না করিতে পারে? তার উপর একটা দুটা লোক ত খাচ্ছে না—খাচ্ছে অনেক লোক, কাজে কাজেই machineএর প্রয়োজন।

৩। Cherry—কুলের মত এক প্রকার ফল; পাকিলে ইহার রং ঘোর লাল, আর অত্যন্ত মিষ্টি। মেয়েরা ইহার রস নিংড়াইয়া গ্লাসে করিয়া দিয়া যায়, আবার কখন কখন ইহারও পিষ্টক

আগেকার মত প্রস্তুত করিয়া খাওয়ায়। তাহা অতি চমৎকার খাইতে লাগে।

৪। Currant—মনেক্কা ও করমচার মত ঠিক নহে। কলসার মত ছোট ফল, ভিতরে একটি ছোট বিচি। ফল পাকিলে ইহার রং হলুদে হয়, মিষ্ট নহে, একটু টক্ লাগে। ইহারও রস নিংড়াইয়া খাওয়া হয়। আবার কখনও ডিম্ পূর্ণ করিয়া দিয়া যায়। তাহাতে দুধ ও বেশী পরিমাণে চিনি দিয়া চামচে করে তুলিয়া খাইতে হয়। আমার কাছে এ ফলটা তত ভাল লাগে না। এদেশের ছেলে মেয়েরা কিন্তু খুব খায়।

৫। Salted cucumber—আমাদের দেশে শসায় কেহ কেহ লবণ দিয়া খায়, এদেশেও সে রকম শসা আছে। কিন্তু এই Salted cucumberএতে লবণ লাগাইতে হয় না। (ইহা অর্দ্ধপক্ক হইলে যেন অম্বর) লাগানর মত আস্বাদন পাওয়া যায়। এটা বড় অদ্ভুত ফল। এতে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং লবণ লাগিয়ে রেখেছেন। আমাদের কলেজের মাঠেতে একটা বড় পেয়ারা গাছের মত শসা গাছ আছে। তাহার botanical নাম magnolia acuminata, গাছে যেমন পেয়ারা ঝোলে এ গাছেও শসা ঠিক সে রকম ঝোলে। গত exhibitionএতে অনেক কৃষক ঐ গাছ দেখে অবাক হয়েছিল। আরও অনেক লিখিতে বাকি রহিল। ক্রমশঃ লিখিব।

প্রত্যেক মেলে চিঠি পত্র না পেলে আমায় জন্য ভাবিবেন না। আমি মানুষদের সঙ্গে আছি—বাঘ, ভালুক বা সাপ বা ম্যালেরিয়া বাতাস পূর্ণ দেশে নাই।

ক্রমশঃ

ভুল ভাঙ্গা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই পারিষদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে আর কি? দিন স্থির পর্য্যন্ত ক'রে এসেছেন, তা' দেবেন বাবু! বসে ভাবছেন কি? বাড়ীর ভিতরে যান, বিভা কা'ল শ্বশুর বাড়ী যাবে, তার উদ্যোগ আয়োজন করুন গে। তবে বেয়াই ম'শায়! গাড়ী ডাক্‌তে বলুন। কা'ল কেন? এখনি যাত্রার উদ্যোগ করুন। প্রথমবার বিভা শ্বশুর বাড়ী যাবে, শুভ লগ্নই ভাল।"

দেবেন্দ্র বাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এক্ষণে কাশীনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বিভাকে এখন পাঠাতে পারি না।"

কাশীনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কেন?"

দেবেন বাবু উপেক্ষার সহিত বলিলেন, "আমার এইরূপ ইচ্ছা।"

কাশীনাথ আবেগের সহিত বলিলেন, "সে কি বেয়াই মশায়! মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন, এখন পাঠাবেন না, এ কেমন কথা! গরিব হোক আর যাই হোক, যখন তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছেন, তখন আর সে বিচারে ফল কি? আমি আমি যে বাড়ীতে ব'লে এসেছি, বৌমাকে না নিয়ে ফিরছি না। এখন আমি কোন মুখে শুধু হাতে ফিরে যাব?"

সেই পারিষদ একটু ব্যঙ্গ ও গর্ব্ব মিশ্রিত স্বরে বলিল, "সে কি বেয়াই মশায়! শুধু হাতে ফিরবেন কেন? এ রাজার সংসার, এখানে কিছুরই অভাব নেই, আপনি যা চা'বেন, তাই পা'বেন। দেবেন বাবু এমন লোক নন্।"

অমর এ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলে নাই। তাহার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল, তবুও সে পিতার সাক্ষাতে নীরব ছিল। আর থাকিতে না পারিয়া একটু তেজের সহিত বলিল, "আমার পিতা এখানে ভিক্ষা করতে আসেন নাই, তাঁর পুত্রবধূকে নিতে এসেছেন। আপনাদের যদি পাঠাতে অমত থাকে, স্পষ্ট ক'রেই বলুন। এমন কারচোপের প্রয়োজন কি?"

এই তেজপূর্ণ অথচ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র বাবু কুপিত হইলেন। বলিলেন, "তবে স্পষ্ট কথাই শুন অমর! বিভাকে শ্রীনগর পাঠা'তে আমার ইচ্ছা নাই। তার থাক্‌বার মত বাড়ী আগে প্রস্তুত কর, তখন তাকে নিতে এস। যত দিন তা না হয়, তত দিন কোন কথা ব'লো না। মাটির ঘরে সে কখনো থাকেনি, থাক্‌বেও না।"

অমর কম্পিত স্বরে বলিল, সেটা আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

কাশীনাথ চিত্র পুত্তলিকার মত বসিয়া ছিলেন। অমর তাঁহাকে বলিল, "বাবা! আর কেন? যথেষ্ট হ'য়েছে, এখন উঠুন এই জন্যই আমি তখন নিষেধ করেছিলাম।"

কাশীনাথ বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবুর একজন পার্শ্বচর বলিল, "সে কি বেয়াই ম'শায়! কতদিন পরে এলেন, এখনি যাবেন কেন? দু'দিন থাকুন, আমোদ আহ্লাদ করুন, তার পরে যাবেন। একান্ত পক্ষে একটু জলযোগ ক'রে যান। বেয়াই বাড়ী এলে মিষ্ট মুখ করতে হয়।"

অমর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পিতার হাত ধরিয়া একেবারে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল, একজন পারিষদ বলিতেছে, "জামাই বাবু রাগ ক'রে গেলেন নাকি?"

দেবেন বাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলার মত চক্র, অমন ঢের রাগ দেখেছি, ও রাগ কত দিন?"

অমর আর শুনিতে চাহিল না। পিতা পুত্রে রাস্তায় বাহির হইয়া জন সমুদ্রে মিশিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। অমরনাথ এখন মতিহারীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। অমরনাথ এম্, এ, পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় ফিরিতে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সুনজরে পড়িয়া একেবারে দুই শত টাকা বেতনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে আসেন। অমরনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমারনাথ এনট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্, এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অমরনাথ একাকী একটী বাসায় থাকিতেন। তাঁহার কার্য্য-নির্ব্বাহ-প্রণালী নিতান্ত আড়ম্বর শূন্য ছিল। একটী মাত্র ভৃত্য তাঁহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত। একটী হিন্দুস্থানী আরদালী তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিত। এই দুইটী লোক ব্যতীত তাঁহার বাসায় আর দাস দাসী কেহই ছিল না।

আজ প্রায় দুই বৎসর গত হইল অমরনাথ শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই হইতে এক দিনের জন্যও আর সে বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই বা সেখানে কোন পত্রাদিও লেখেন নাই। আধুনিক নব বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যেমন চিঠি পত্রাদি লিখিবার নিয়ম প্রচলিত আছে অমর নাথ এবং বিভাময়ীর মধ্যে সেরূপ দেখা যায় নাই। অমরনাথ উচ্চশিক্ষিত যুবক হইলেও সম্পূর্ণ 'সেকেলে' ধরণের ছিলেন। শ্বশুর-বাটীর নিকটে থাকিয়াও অন্যান্য যুবকের ন্যায় প্রতি শনিবারে শ্বশুর-বাটী যাইতেন না। দুই তিন মাস অন্তর হয়তঃ কচিৎ একদিন যাইতেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় অতি অল্পই হইয়াছিল। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে পত্নীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু বিভাময়ী তাহার কোন উত্তর দেন নাই। অমরনাথও আর কখনও স্ত্রীকে পত্র লেখেন নাই।

জামাতার ভাল চাকুরী হওয়ার সংবাদে তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া যাইবার জন্য অনেক বার পত্র দিয়াছেন, অমরনাথ সে সব পত্রের কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই, অনেক পত্র লেখার পরে বিরক্ত হইয়া একবার শ্বশুরকে লিখিয়াছিলেন, "আমি এখানে হীন অবস্থায় থাকিলেও আপনার অবস্থায় বেশ সন্তুষ্টই আছি, আর কাহাকেও এখানে আনিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি, আপনারা আর আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না।"

অমরনাথের এই পত্র পাইয়া তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী হতাশ হইয়া কিছুদিন আর পত্রাদি লেখেন নাই।

একদিন অমরনাথ কাছারী হইতে আসিয়া সবে মাত্র বসিয়াছেন এমন সময়ে হরকরা খানিকয়েক পত্র দিয়া গেল। অমরনাথ পত্র গুলি হাতে লইয়া দেখিলেন, একখানি শ্রীনগর হইতে তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন। কয়দিন বাড়ীর সংবাদ

না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে পিতার পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"পরম কল্যাণবরেষু—

অত্র পত্রে শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে।

কয়েক দিন তোমার কুশল সম্বাদ না পাইয়া চিন্তাযুক্ত আছি, আশা করি, ভগবদাশীর্ব্বাদে কুশলে আছ। সম্প্রতি শ্রীমতী উষাবালার শুভ বিবাহ না দিয়া আর রাখিবার উপায় নাই। তোমার নিষেধ ছিল বলিয়া আমি এতদিন চেষ্টা করি নাই। এক্ষণে আশু বিবাহ দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কয়টী সম্বন্ধ উপস্থিত আছে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন স্থানে স্থির করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমান্ কুমারনাথের বিবাহের জন্য তোমার গর্ভধারিণী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমারও তাহাতে মত আছে। শেষ জীবনে সুশীল পুত্রবধূদ্বয় সেবা শুশ্রূষা করিবেন; আমরা তাঁহাদের হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্ম চিন্তায় সময় কাটাইব, বড় আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান বড় সাধে বাদ সাধিয়াছেন। যাহা হউক এখন কুমারের বিবাহ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি।

মনোহরপুরের শ্যামাচরণ দত্ত অবস্থাপন্ন লোক। তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিলে টাকা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মেয়েটী তত ভাল নয়। আর তোমার রামসদয় খুড়ো, তাঁহার কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ দিতে বিশেষ উৎসুক। মেয়েটী পরমসুন্দরী কিন্তু রামসদয়ের অবস্থা তো জান? শাঁখা, সাড়ী ছাড়া তাঁহার আর কিছু দিবার শক্তি নাই। মেয়েটী কিন্তু বড় লক্ষ্মী। তোমার অভিমত শীঘ্র জানাইবে।

বাটীর সমাচার উপস্থিত মঙ্গল। তোমার কুশল সম্বাদ সর্ব্বদা প্রার্থনীয়। কিমধিকমিতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক তোমার পিতা।"

পুঃ—বাবা! আমাদের একটা অনুরোধ, বেয়াই মহাশয় স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া পুনঃপুনঃ আমাকে পত্র লিখিতেছেন, তিনি অন্যায় করিয়াছিলেন, সেজন্য এখন বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছেন। বৌমাকে আনিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিতেছেন। আর বৌমা ত কোন দোষেই দোষী নন্। বাবা! আমার মাকে শীঘ্র ঘরে নিয়ে এস। ঘরের লক্ষ্মী কতদিন পরের বাড়ী থাকিবেন? দুই বৌমাকে এক সঙ্গে দেখিয়া নয়ন ও জীবন সফল করিব। অজিতকুমারের সংবাদ পাইয়াছ কি না জানিতে ইচ্ছা করি।"

৮

যে রাত্রে অমরনাথ পিতার সহিত শ্বশুরবাড়ী হইতে আসেন, সেই রাত্রি হইতে অজিত কুমারের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রাত্রিশেষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অজিতকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অমর নাথ প্রত্যূষে অজিতকে

দেখিতে না পাইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। অমর নাথ প্রথমে মনে করিলেন, অজিত হঠাৎ বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে স্বয়ং যাইয়া দেখিলেন, অজিত বাড়ী যান নাই। অজিতের পিতা, অজিতের কোনই সংবাদ বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ পুত্রের নিরুদ্দেশ-সংবাদ পাইয়া অজিতের পিতা বিশেষ উৎকন্ঠিত হইলেন। তিনি চারি দিকে পুত্রের সন্ধানার্থ লোক পাঠাইলেন। একমাস ধরিয়া তাহারা সহর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল। বৃথা চেষ্টা! অজিতের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

অজিতের পিতা নিরস্ত হন নাই। সর্ব্বগুণাধার প্রাণাধিক পুত্রের এমন আকস্মিক অদর্শনে কোন্ স্নেহময় পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অজিতের পিতা দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন এবং পুলিশেও সংবাদ দিলেন। ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। এখনও পর্য্যন্ত নানাস্থানে অজিতের সন্ধান চলিতেছে।

অমরনাথ নিজে অনেক দিন পর্য্যন্ত যথাসাধ্য প্রিয়বন্ধুর সন্ধান করিয়াছেন। অজিতের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের কোন কারণ অমর জানিতে পারেন নাই। আজ পিতার পত্র পাইয়া অজিতের জন্য তাঁহার অত্যন্ত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায়, অজিত! কল্পনায় যাহাকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়া তুমি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে, সেই তোমার অমর আজ সত্য সত্যই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছে। আজ তুমি কোথায়? তোমার যে দুঃখ-কাহিনী আমার নিকটে বলিবে বলিয়াছিলে, তাহা আমাকে বলিবার অবসর পর্য্যন্ত সহিল না"—অমরের চক্ষুতে জল আসিল।

ভাবনা অন্য পথে ধাবিত হইল। অমর ভাবিলেন, "পিতা দেশে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ লিখিতেছেন। আমার ও মন ছুটিয়াছে। অনেক দিন জন্মভূমি, এবং পিতা মাতাকে দেখি নাই। যাইবারও বাধা নাই। এক মাসের অবসর গ্রহণ করিয়াছি, এখনি যাইতে পারি. কিন্তু দেশে গেলেই কলিকাতা যাইতে হইবে। পিতার আদেশ, আমার স্ত্রীকে আনিতে হইবে। আমার যতই অনিচ্ছা থাক, পিতার আদেশ কখনই অবহেলা করিতে পারিব না।"

পাঠক! পাঠিকা! ব্যাপারটী অসম্ভব মনে করিবেন না।

অমরনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক হইলেও আধুনিক নব্য সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতার বাক্য, দেবতার আদেশের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। জীবন দিয়াও পিতৃবাক্য পালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

অমরনাথ আবার ভাবিলেন, শ্বশুর শাশুড়ী এখন পাঠাইতে অমত করিবেন

না বুঝিতেছি, কিন্তু তাহার মনের ভাব কি? এত দিন বিবাহ হইয়াছে, আজিও তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইলাম না। আর জানিবারই বা বাকি কোথায়? ধনবানের কন্যা, অতি যত্নে পালিতা, আশৈশব কেবল লোকের উপরে প্রভুত্ব করিতেই শিখিয়াছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ, মমতা বা প্রণয় থাকা অসম্ভব। যদি আমার প্রতি তাহার একটুও মমতা থাকিত, তবে কি সে এত কালের মধ্যে আমাকে একখানিও পত্র লিখিত না? সে ত এখন আর ক্ষুদ্র বালিকাটী নাই? সামান্য এক খানা পত্র লিখিতে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। তাহার পিতা মাতা অবশ্য নিষেধ করেন নাই। বিবাহ হওয়া অবধি যতটুকু সময় দেখা হইয়াছে, বিভাময়ী অমরনাথের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। অমরনাথ তখন মনে করিত, লজ্জা বশতঃই বিভা এমন ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এখন অমরের মনে হইল, তাহার সে ভাবে গর্ব্ব ও দম্ভ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। স্বামীর নিকটে স্ত্রীর লজ্জা কত দিন থাকিতে পারে?

অমরের ভাবনার বিরাম নাই। একটীর পরে আর একটী ভাবনা আসিয়া তাঁহার সমগ্র চিত্তকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। নানা ভাবনায় অমর নাথ আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

৯

প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই অমর নাথ পিতাকে পত্র লিখিলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। ভাবিতে বিলম্ব হইল না। তিনি লিখিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রাম সদয় খুড়োর কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবেন। আমি শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছি। আর আর বিষয় সাক্ষাতে শ্রীচরণে নিবেদন করিব। নিবেদন মিতি—

প্রণত দাস, অমর।"

পত্র খানি ডাকে পাঠাইয়া অমর প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। রাত্রিতে নানা চিন্তায় কিছুই আহার হয় নাই। সুনিদ্রার পরে মনের অবসাদ দূর হইয়াছে। এখন ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় ভৃত্যকে এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন। অমর নাথ আধুনিক বাবুদিগের ন্যায় চা-পায়ী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা চায়ের ব্যবহার করিতেন না। মধ্যে মধ্যে শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া কখন কখন পান করিতেন।

চা পান করিয়া অমর নাথ একখানি সংবাদ পত্র দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে এখনই বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক। অমর ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল। দেখিলেন, তাঁহার

শ্বশুর, সেই ধন গর্ব্বিত, মহা অহঙ্কারী প্রতাপশালী দেবেন্দ্রবিজয় বাবু সামান্য বেশে তাঁহার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত।

বিস্মিত অমরকে প্রণাম করিবার অবসর না দিয়া দেবেন বাবু উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। আবেগ পূরিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা অমরনাথ! আমাদের ভ্রম দূর হ'য়েছে। অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতেই ফলতে আরম্ভ হ'য়েছে। অনুতাপে হৃদয় পুড়ে যা'চ্ছে। এখন ও যদি উপায় কর্‌তে পার, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

অমর তাঁহার কথার কোনরূপ ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তবে একটা কিছু হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শ্বশুরের হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে নিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টার পরে অমর জানিতে পারিলেন; বিভাময়ী সঙ্কটাপন্ন পীড়িতা, জীবনের আশা নাই বলিয়া চিকিৎসকেরা জবাব দিয়াছে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া বিভাময়ী একটীবার মাত্র অমরনাথকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। দেবেন বাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন;—"বাবা! আর কেউ এলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারবেনা। হয়ত তুমি বিশ্বাস করবে না। মায়ের আমার জীবনের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে, তাই আমি নিজে এসেছি। নতুবা তা'কে সে অবস্থায় রেখে কোন্ চণ্ডাল পিতা স্থানান্তরে যেতে পারে? চল বাবা! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। বিলম্ব কর্‌লে হয়ত আর দেখা হবে না।"

শ্বশুরের কথা শুনিতে শুনিতে অমরের নয়ন আপনাআপনি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ কত কাল পরে তিনি বিভাময়ীর কথা শুনিলেন। অমরনাথ মনে করিলেন, "বিভা পীড়িতা, মুমূর্ষু! সে আমাকে দেখিতে চায়, কেন? তবে কি সে আমায় ভাল বাসে। হায়! কি ভুলই করিয়াছি।"

যেখানকার দ্রব্য সেইখানে পড়িয়া রহিল। অস্নাত অনাহারী অমরনাথ শ্বশুরের সহিত কলিকাতায় রহনা হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে তারযোগে আপনার বিপদ জানাইলেন এবং বিশ্বাসী ভৃত্যকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরেই একটী রুক্ষকেশ, মলিন বেশধারী লোক অমরনাথের বাসা বাটীর দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডেপুটী বাবু বাসায় আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "না, তাঁর স্ত্রীর ব্যারাম, তিনি এইমাত্র কলিকাতায় রওনা হইলেন।"

লোকটি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

১০

যে দিন অমরনাথ রাগ করিয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসেন সেই দিন হইতে বিভাময়ীর ভাবান্তর উপস্থিত হয়, জনপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী পিতৃ ভবনের মধ্যে বিভাময়ী আপনাকে নিতান্তই একাকিনী বোধ করিতে থাকে। অট্টালিকায় বাস, এবং দাস

দাসী দ্বারা সেবিতা হইয়াও, বিভাময়ীর জীবন শূন্য ও শান্তিহীন মনে হইত। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, বিভাময়ীর মনের অশান্তি ততই বাড়িতে লাগিল। এমন অবস্থায় কি মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? বিভাময়ী বালিকা মাত্র।

বিভাময়ী কেবলই ভাবে, "পিতা কেন তাঁহাকে কর্কশ কথা বলিলেন? কেন আমাকে পাঠাইলেন না? তিনি যে বড় আশা করিয়া আমাকে নিতে আসিয়াছিলেন। বাবা যখন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন, তখন তাঁহার মনে না জানি কত কষ্ট হইয়াছিল? কিন্তু তিনি বা ফিরিয়া গেলেন কেন। কেন তিনি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না? কেন আমাকে জোর করিয়া নিয়া গেলেন না? সে অধিকার ত তাঁহার ছিল?

আবার ভাবিত, পিতা মাতা আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন বলিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন। পাছে আমি ক্লেশ পাই, সেই জন্য স্বামীর সঙ্গে যাইতে দেন নাই। কিন্তু ইহাতে যে আমার মনের সুখ শান্তি একেবারেই নষ্ট হইল, তাহা কি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না? হায়, প্রভু! আমি ত কোন দোষে দোষী নই, তবে কি জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে? আর কি তুমি আমার কাছে আসিবে না?"

বালিকা আর ভাবিতে পারে না।

বিভাময়ী অনেক দিন মনে করিয়াছে, স্বামীকে পত্র লিখিবে। কতবার কাগজ কলম নিয়া লিখিতে বসিয়াছে। কিন্তু কি জানি কেন, আবার কি ভাবিয়া বিরত হইয়াছে। যখনই পত্র লিখিবার কথা মনে হইত, তখনই ভাবিত, কই! তিনি ত একখানা পত্র আমাকে লেখেন নাই? আমি কি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব?'

হায় অভিমানিনি! আপন সমূহ বিপদ উপস্থিত জানিয়াও নারীস্বভাবসুলভ অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না?

বিভা স্বামীকে পত্র লিখিতে পারিল না।

ক্ষুদ্র বালিকা চিন্তার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে শয্যা আশ্রয় করিল। দিন দিন তিল তিল করিয়া তাহার জীবনী শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। শরীর শীর্ণ ও মুখ মণ্ডল বিশুষ্ক। বিভা আর উঠিয়া বসিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, সরস্বতীর শুভ বিবাহে

মাতার

আশীষ ভিক্ষা।

নন্দিনী মোর সুকন্যা মোর
বক্ষের নিধি প্রাণের ধন,

মনে পড়ে ওরে আজ শুভদিনে
তোর সেই যে জন্মক্ষণ।

মনে পড়ে সেই মূঢ় শিশু তুই
ক্রন্দন কল্লোলে ভরিলি দিক,
বঙ্গ মাতার অঙ্গন ভরি
কে এলরে বলি গাহিল পিক।
বিভুর আজ্ঞায় সুকোমল কায়
জন্মভূমির বাতাস জল,
বন্দনা করি নন্দিনী তোরে
পাতি দিল মার শ্যামাঞ্চল।
কত যে সঙ্কট কত যে বিঘ্ন
ঝড় ঝঞ্ঝার ভীষণ দুঃখে,
রক্ষিতে তোমারে হৃদি অকাতরে
দিয়েছি কত যে মরণ মুখে।
যবে সিন্ধু এসে গর্জ্জেছিল হেসে
যুঝিল জীবন মৃত্যুর সনে,
বিভুর কৃপায় সে সঙ্কট যায়
পুনঃ ফিরে এলে নব জীবনে।
আজ শুভ দিনে কত পড়ে মনে
তোর যে বাল্য তোর কৈশোর,
আজ ভরা গঙ্গা পূর্ণ জোয়ারে
দিক উছলিত নব কল্লোল।
সেই প্রিয় ধনে ধর্ম্ম প্রেম সনে
বাঁধি দিতে আজ এসেছি নাথ,
তোমার করুণ প্রসাদ অরুণ
'করুক' এদের সুপ্রভাত।
কোথা ঋষীন্দ্র রাজনারায়ণ
"কুমারী রতন" সাধের নামে,
প্রথমে আশীষি বরে ছিলে তারে
আশীষ কর গো এ শুভ দিনে।
মনস্বী যোগেন্দ্র ব্রহ্ম যোগাসনে
কোন্ সপ্ত স্বর্গে বিভুর প্রেমে,
তব স্নেহাশীষ এসেছে কি বহি
ফুলের সৌরভে মলয় সনে?
ঊষা কি তোমার বিমল হাস্য
মিলন পুলকে আননে ভাসে,
এসেছ কি ঊষা নব ঊষা বহি
এ দুটি নবীন পথিক পাশে?
হে মঙ্গলময় তব প্রেম জয়
বিশ্বের মাঝারে ফুটায় হাসি,
শচীন্দ্র "রতনে" পথিক নবীনে
আশীষ কর গো তুমি গো আসি।
এস প্রিয়তমা কুমুদিনী ওমা
পতিকুলে ধ্রুব হও গো তুমি,
জনপদ কল্যাণী, সৌভাগ্যশালিনী,
বিশ্বজনের হও আদরিণী।
দুঃখ অশ্রুজল, যত অমঙ্গল,
শত সঙ্কট থাক হেথা পড়ে,
গার্গী মৈত্রেয়ী সমা, অরুন্ধতী রমা,
রমণী রতন হও বিভু বরে।
কেন প্রাণ তোরে রাখে হেথা ধরে
সুখী হও বৎস যাক্ বিঘ্ন দূরে।
দেশ ও সমাজ, জগতের কাজ,
সাধি চলে যেও কর্ত্তব্য ভরে।
ওগো বিশ্বেশ্বর, ওঁকার অক্ষর,
তব সম প্রিয় কে আর আছে,
এ দুটি প্রাণে, চরণ প্রান্তে,
রাখ চিরতরে সকলে যাচে।
মা।

শ্রীমান্ শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং শ্রীমতী কুমুদিনীর শুভ বিবাহে

বধূ-বরণ।

"সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাম্ ভব
সাম্রাজ্ঞী ননন্দরি ভব, সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু"

আমাদের আঁধার কুটিরে
কে আসিছ দিক্ উজলিয়া,
চির মৌন শুষ্ক ফুল বন,
তোমা দেখি উঠিছে হাসিয়া।
আমরা যে দীন অভাজন—
কোথা দিব বসিবার স্থান,
শত তাপে দগ্ধ হিয়া আজি,
তাই কি তোমারে দিব দান?
তুমি যে গো স্বরগবাসিনী
অমর-পালিতা দেববালা,
কেন তুমি আসিলে মরতে,
জুড়াইতে তাপিতের জ্বালা?
নাহি জানি কোন্ সুপ্রভাতে,
গিরি শিরে—আত্ম বিসর্জ্জিয়া,
কে সাধিল মহতী সাধনা,
তব কৃপা অলক্ষ্যে মাগিয়া।
না জানি সে তরুণ তাপস
শীতাতপ সহিয়াছে কত,
সুখ দুঃখ নাহি ছিল মনে,
একাগ্রতা বাল্মীকির মত।
তারি পুণ্যে—তারি তপোবলে,
এলে তুমি স্বর্গ পরিহরি,
মানবেরে কৃতার্থ করিতে—
দীন গৃহে রাজ রাজেশ্বরী।

রত্ন তুমি সংসার-সাগরে
পুষ্প মাঝে পবিত্র কমল,
জীবনের আনন্দ প্রতিমা,
কোথা রাখি—কোথা যোগ্য স্থল?
এলে যদি—এস দেববালা!
সুখ শান্তি সুমঙ্গল সহ,
বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ
তব শিরে থাক্ অহরহঃ।
এলে যদি—এস দেববালা।
ভক্তি-প্রীতি আনন্দ লইয়া,
তব বুকে সঞ্চিত অমৃত
গৃহে, দেশে, দাও বিলাইয়া।
এলে যদি—এস দেববালা,
লইয়া সৌভাগ্য বরাভয়,
সীমন্তের মঙ্গল সিন্দূর,
হাতে শাঁখা হউক অক্ষয়।
এস এস এস দেববালা!
লক্ষ্মী হয়ে চিরানন্দ ধামে,
তৃপ্ত হোক তৃষিত নয়ন,
দেখি তোমা শচীন্দ্রের বামে।

কলিকাতা।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল—বঙ্গাব্দ।
শুভাশীর্ব্বাদিকা—
শ্রীমানকুমারী বসু।

Address of welcome to Her Highness The Dowager Maharani of Cooch Behar C. I.

আবার এসেছি আবার সকলে
নয়ন আসারে ভাসিতে ভাসিতে,
আবার এসেছি দুঃখী ভগ্নী দলে
মনের বেদনা এসেছি কহিতে।
বর্ষে বর্ষে আসি নিতে পুরস্কার,
তায় কেন ঝরে অশ্রু আমাদের,
এ হেন দিনেতে হৃদয় সবার
ব্যথিত আহত আঘাতে শোকের।
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গে—এই কি নিয়তি!
সে দিন কেঁদেছি কতই এখানে,
অশ্রুভরা চোখে চির অশ্রু গতি
এসেছি কাঁদিতে--কাঁদি ভাঙ্গা প্রাণে।
নৃপ "নৃপেন্দ্রের" সে মূর্ত্তি এখনো
জাগিছে হৃদয়ে চিত্রার্পিতের প্রায়,
ভুলিব কি মোরা ? ভুলিব কখন ?
সে মূর্ত্তি তাঁহার রয়েছে হেথায়।
বজ্রাহতে পুনঃ হয় বজ্রপাত ?
না ভুলিতে সেই ঋষি মূর্ত্তি হায়
উছসি আবার বঙ্গের আঘাত
আসিল সংবাদ তাড়িত বার্ত্তায়!
নূতন নৃপতি—"রাজরাজেন্দ্র" নাই,
আশার নৃপতি গেছেন চলিয়া,
এস ভগ্নি—কাঁদি মিলিয়া সবাই
কাজ নাই আর পুরস্কার নিয়া!
কি দিবে মোদের—মাতঃ মহারাণি,
চাই না আমরা চাই না কিছুই,
মূল্যবান যাহা—শিরোমণি জানি
জানিতাম মোরা তাঁদের শুধুই!
হারায়েছি তাহা—কি নিব আমরা ?
ভক্তকন্যা তুমি মাতঃ মহারাণি,
হৃদয় তোমার—প্রেম ভক্তি ভরা,
পিতার মতন নিয়ে ক্রুশখানি—
তুমিও চলেছ ক্রুশের প্রচারে
তুমিও এসেছ তাঁহার মতন—
"ক্রুশ" হাতে নিয়ে সুদূর "বিহারে"
নমি মোরা তোমা ধরিয়া চরণ।
সমাধিতে বস সমাহিত হ'য়ে
তপস্বিনী যথা তপস্যায় রত
প্রার্থনা তোমার ব্যাকুল হৃদয়ে
ভাঙ্গা প্রাণে শান্তি দিবে তায় কত।
তোমার সুকাজ, তোমার জীবন
তোমার চরিত্র—আমাদের পথ,
তোমার উত্তম, উৎসাহ বচন
করিবে মোদের পূর্ণ মনোরথ।
তোমার পশ্চাতে এসেছি চলিতে,
মাতার মতন আমাদের নিয়ে
চল তুমি চল—নিয়ে "ক্রুশ" হাতে,
চলিব আমরা তোমাকে ধরিয়ে।
জানিব মানিব—তুমি আমাদের
চির মাতা তুমি দরিদ্র কন্যার
ভক্তি, শ্রদ্ধা চির দিব হৃদয়ের
দিই আজ পদে শত নমস্কার।

Address of welcome to Her Highness The Maharani of Cooch Behar.

এস এস মহারাণি, শ্রদ্ধা ভক্তি মালা আনি,
দিই আজ তোমার গলেতে।
আনন্দে বরণ করি, ফুল মালা গলে ধরি,
ফুলরাণী তুমি এসেছি দেখিতে।
'বরদা' প্রাসাদ মাঝে, ছিলে ফুল্ল ফুল সাজে,
এখানেও তুমি রাজার মহিষী।
বড় আশা আমাদের, বড় আশা "বিহারের"
দেখিতে তোমারে বড় ভাল বাসি।
এসেছ ভালই তুমি, ধন্য এ বিহার ভূমি
কত আনন্দ বঙ্গ মহিলার।
দেখ মহারাণি আজ, কি আনন্দ হৃদি মাঝ,
"বরদা" "বিহার"—এক পরিবার।
নিবেদন আমাদের, ভালবাসা হৃদয়ের,
দিও আমাদের তেমনি করিয়া।

"বরদা" বালারে যথা, বরদা—মহিষী মাতা
দেন ভালবাসা হৃদয় ভরিয়া।
দিও আমাদের, ভালবাসা হৃদয়ের,
দিও মহারাণি তেমনি করিয়া,
বিহার ভূমিতে যথা, বিহার মহিষী মাতা,
দেন ভালবাসা পরাণ ভরিয়া।
আমাদের শিক্ষা, আমাদের দীক্ষা,
নিও তুমি তার মাতার সঙ্গেতে।
আমাদের ভাল বেসে, আসিয়াছ এই দেশে,
এসেছ কেবল আমাদের হিতে।
আজ তাই শুভক্ষণে, আজ শুভ সম্মিলনে,
কৃতজ্ঞতা, ভক্তি লও আমাদের।
আমরা সকলে মিলে, দুঃখিনী ভগিনী দলে,
নত শিরে দিই শ্রদ্ধা হৃদয়ের।

সুনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ।

১৯১৩-১৪

শিক্ষা-প্রণালী। বিগত পাঁচ বৎসর হইতে সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুসারে শিক্ষা-দান চলিয়া আসিতেছে। বালিকাদিগের উপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা এবং শিল্প শিক্ষা দানই এ প্রণালীর উদ্দেশ্য।

পরীক্ষার ফল। বিগত ১৯১৩ সালের পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত বালিকাগণ Anglo Vernacular Upper Primary Standard পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

(পারদর্শিতানুসারে)

কুমারী পঙ্কজিনী চক্রবর্ত্তী, প্রথম বিভাগ
শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত ,,

উক্ত সালের Anglo Vernacular Lower Primary Standard পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

(পারদর্শিতানুসারে)

কুমারী লীলাবতী রায় প্রথম বিভাগ
,, মালতীলতা চট্টোপাধ্যায় ,,
,, অচল নন্দিনী চক্রবর্ত্তী ,,
,, প্রতিভা কুমারী রায় ,,

" নগেন্দ্র বালা গুহ "
" যোগমায়া দাস গুহ "
" হেম প্রভা বাগচি "
" সৌদামিনী সরকার "
" প্রতিভাবতী সেন "
" যোড়শীকুমারী ভৌমিক "
" ঈশানীবালা মুখোপাধ্যায় "
" নিভাননী সরকার "
" আমিনা খাতুন "
" স্নেহলতা রায় দ্বিতীয় বিভাগ।
" বিভাবতী লাহিড়ী "

উপরিউক্ত বালিকাগণের মধ্যে যে বালিকা Anglo Vernacular Lower Primary পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, স্কুলের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাকে মাসিক দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে হিন্দু বালিকাটি অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি আদিম কুচবিহার ও যেটি ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি এ দেশীয় মুসলমান বালিকা।

ছাত্রী সংখ্যা।—১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসের ছাত্রী সংখ্যা ১৯৭২ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ জন অধিক। গড় উপস্থিতি ১৭৫, অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫ জন অধিক। এই সকল ছাত্রীদের মধ্যে ৯ জন মুসলমান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪ জন কম। ৫ জন ব্রাহ্ম অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১ জন অধিক। ১ জন খৃষ্টান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের সমান। ২৩ জন রাজগণ ও কুচবিহারের আদিম অধিবাসী অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৪ জন কম। এই ২৩ জনের মধ্যে ৮ জন বালিকা রাজগণ পরিবার ভুক্ত। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে স্থানীয় রাজগণ-পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার সমাদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

মহিলা বিভাগ। নানা অসুবিধা নিবন্ধন এই শ্রেণীর কার্য্য বিগত জুলাই মাস হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজগণ মহিলাদিগকে শিল্প শিক্ষা বিধানই এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোম রাজ্যের ইতিহাস।

৬ অধ্যায়।

পার্টিনাক্স, জুলিএনস, সিভেরস, কারেকেলা ওলিটা, মাক্রিনস, হালিও গেবোলস, আলেকজাণ্ডার সিভেরস, মাক্সিমস, পিউপিনস ও বালবিনস, গার্ডিয়ানস, ফিলিপ, ডিসিয়স, গালস ও ভালিরিয়ান।

১। পার্টিনাক্‌স নামে এক প্রাচীন সেনেটর কমোডসের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি জেনোয়া প্রদেশের এক

নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নিজে অত্যন্ত সাহসী, নম্র, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। যে সৈন্যেরা কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করে, ২ মাস ৬ দিবস রাজত্বের পর তাহারাই আবার তাঁহাকে বধ করিল।

২। এক্ষণে বহুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি রাজ্যলাভার্থে একান্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ইহাতে রক্ষক সেনাগণ (ক) এক কৌতুকাবহ পণ করিল যে, যে ব্যক্তি অধিক টাকা দিতে পারিবে তাহাকে সাম্রাজ্য বিক্রয় করা যাইবে। অনন্তর ডিডিয়স্ জুলিয়েনস নামে এক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি; অনেক টাকা দিয়া রোম রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু পাঁচ মাসের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সিভেরসের আজ্ঞায় তাঁহার শিরশ্ছেদন হইল।

৩। সিভেরস যেমন যুদ্ধবিশারদ ছিলেন, সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জয়লাভও করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দী নাইগেল ও আলবিডসকে পরাভূত এবং সেনেটকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অনন্তর ২০৮ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে ব্রিটেন গমন করত ফোর্থ হইতে ক্লাইড নদী পর্য্যন্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অবশেষে ১৭ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করিয়া ২১১ খৃঃ ইয়র্কে প্রাণত্যাগ করেন।

(ক) আগষ্টস, প্রিটোরিয়ান্, গার্ড বলিয়া আপনার কতকগুলি দেহ রক্ষক নিযুক্ত করেন। ইহারা পরে এরূপ প্রবল হইল যে স্বেচ্ছানুসারে সম্রাটদিগকে নিযুক্ত, পদচ্যুত বা হত করিত।

৪। মাক্রিনস্ ও হালি ও গাবেলসের ন্যায় কারেকেলা ও লিটা নামে সিভেরসের দুই পাপিষ্ঠ পুত্র ছিল। তাহারাই পরে সিংহাসন অধিকার করিয়া যাবতীয় লোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

৫। মাক্রিনস্ মুরবংশীয়,—তাহার আদিমাবস্থা অত্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল। সে ১ বৎসর ২ মাস রোমে রাজত্ব করে। কারেকেলার পুত্র হেলিওগেবেলস ৩ বৎসর ৯ মাস রোমে রাজত্ব করে। তাহার খুল্লতাত পুত্র আলেকজাণ্ডার সিভেরস মহৎ লোক ছিলেন। অতঃপর তিনি সম্রাট হইয়া ১৩ বৎসর রাজত্বের পর বিদ্রোহী সৈন্যগণ দ্বারা মেণ্টনগরে নিহত হন।

৬। অতঃপর মাক্সিমস ও তাঁহার পুত্র রোমের সম্রাট হইলেন। মাক্সিমস্ প্রথমে থ্রেস প্রদেশের এক মেষপালক ছিলেন, পরে সৈন্যাধ্যক্ষ ও ক্রমে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তিনি দয়ালু কিন্তু স্বেচ্ছাচারী নৃপতি ছিলেন এবং দুই বৎসর রাজত্বের পর রক্ষক সেনা দ্বারা হত হন।

৭। মাক্সিমসের মৃত্যু হইলে সৈনিক পুরুষেরাই রোমের অধীশ্বর হইল। তাহাদিগের ক্ষমতার সীমা কি! তাহারা রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্রাট করিত এবং ইচ্ছা হইলে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিতে পারিত। এই জন্য পরবর্ত্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে রোমে ৫০ জনেরও অধিক সম্রাট হয়।

৮। বালবিনস মাক্সিমসের উত্তরাধিকারী হইয়া পরে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিনাশিত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী গার্ডিয়ানস। ফিলিপ তাঁহাকে নিপাত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। (ক) পরে ডিসিয়স সম্রাট হইলেন। তিনি যে দুই বৎসর শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খৃষ্টানদিগের প্রতি উপদ্রবকারী ও অত্যাচারী বলিয়া খ্যাত হন।

গালস, ভলসিনিয়স ও ইমিলেনস প্রত্যেকে অতি অল্পকাল করিয়া রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে ভালিরিয়ান সম্রাট হইয়া পারস্যের রাজা সেপর কর্ত্তৃক ইডেসরের যুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন এবং অল্পদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

৭ অধ্যায়।

গালিনিয়স, ক্লডিয়স, কুইণ্টিলিয়স, অরিলিয়স, টেসিটস ইত্যাদির রাজত্ব।

১। গালিনিয়স তাঁহার পিতা ভালিরিয়ানের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি অত্যন্ত রিপুপরায়ণ ছিলেন এবং সেনাগণ কর্ত্তৃক হত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিশ জন অত্যাচারী লোক সম্রাট হইবার জন্য এক কালে উত্থিত হয় এবং মহা গোলযোগ উপস্থিত করে।

২। এইরূপ বিবাদ কলহে সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীন বল হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুগণ আসিয়া রোম নগর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

৩। ক্লডিয়স (দ্বিতীয়), গালিনিয়সের উত্তরাধিকারী। তিনি তৎকালের এক জন মহৎ এবং বিদ্যালোকসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। ২৬৯ খৃষ্টাব্দে ডানিউব নদীর তীরে তিনি গথদিগের সমূলোচ্ছেদ করেন। তাঁহার পুত্র কুইণ্টিলিয়সের ১৫ দিন মাত্র রাজত্বের পর অরিলিয়স সম্রাট হইলেন। তিনি পল্মিরায়ার রাণী জেনোনিয়াকে পরাভূত করিয়া কারারুদ্ধ করেন।

৪। অতঃপর অরিলিয়স ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া নিউকেপোরস কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। বৃদ্ধ টেসিটস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া ছয় মাস রাজত্ব করিবার পর স্বীয় ভ্রাতা ফ্লোরিয়েনসের করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া যান। সিরিয়াধিপতি প্রোবস বলপূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া ছয় বৎসর শাসন করেন। পরে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিপাত করিল।

৫। প্রোবাসের পর কেরস রাজা হন। তিনি এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার দুই পুত্র নিউমিরিনস ও কেরিনস রাজ্যাধিকারী হয়। কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্যে অতি অল্প কাল রাজত্ব ভোগ হইয়াছিল।

৬। ডালমিসিয়া বাসী জাই ওক্লি-

(ক) ফিলিপ যে বৎসর সম্রাট হয়েন সেই বর্ষে রোমে সহস্র সাম্বৎসরিক বর্ষোৎসব হয়। এই উপলক্ষে যেরূপ ঘটা হয়, রোম কোন কালেই সেরূপ দর্শন করেন নাই।

সিয়ন তৎপরে সম্রাট হন। ইনি অতি নীচ বংশজাত। কিন্তু তাঁহার গুণ অতীব মহৎ ও উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি ২৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হইয়া মাক্সিমিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে আপনার সহকারী করিয়া তাঁহার উপর রাজ্যের পশ্চিম অংশের ভার দিলেন এবং আপনি পূর্ব্বাংশ মাত্র শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আরও কনষ্টান্টিয়স্ ও গালিরিয়সকে সিজর উপাধি দিয়া, আপনাদিগের সহকারী নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে চারি ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

৭। ডাইওক্লিসিয়ন কুড়ি বৎসর ও মাক্সিমিয়ান আট বৎসর রাজত্ব করিয়া কনষ্টান্টিয়স ও গালিরিয়সের উপর রাজ্যের ভার সমর্পণ করেন। ইঁহাদিগের পর কনষ্টান্টিয়সের পুত্র কনষ্টাণ্টাইন দি গ্রেট সম্রাট হইলেন (৩০৬খৃঃ)। তিনি ব্রিটন দেশের ইয়র্কসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন।

৮। কনষ্টাণ্টাইন সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রোম-সম্রাট ছিলেন। তিনি রোম হইতে বিজানসিয়মে রাজধানী লইয়া যান। পরে তাঁহার নামানুসারে ৩৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরের নাম কনষ্টান্টিনোপল্ হয়।

৯। কনষ্টাণ্টাইন রোম রাজ্যকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাঁহার তিন পুত্র কনষ্টাণ্টাইন, কনষ্টান্স ও কনষ্টান্সকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া ভয়ানক ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত করিলেন এবং তাহাতে সকলেই উচ্চাভিলাষের পুরস্কার স্বরূপ মৃত্যুর গ্রাসে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। রোম রাজ্য এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ অসভ্য জাতিদিগকে আক্রমণ জন্য আহ্বান করিতে লাগিল।

৮ অধ্যায়।

জুলিয়ান দি আপোষ্টেট হইতে রোমের শেষ সম্রাট হনোরিয়স।

১। জুলিয়ান, কনষ্টাইন দি গ্রেটের পৌত্র ও কনষ্টান্সের পুত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহাকে আপষ্টেট অর্থাৎ পতিত বা বিধর্ম্মী বলে। তিনি অতিশয় সাহসিক রাজা ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার বীরত্ব ও প্রজাহিতৈষিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। এই সময়ে জার্ম্মানেরা রাইন নদী পার হইয়া গলদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভয়ে তাহারা পুনরায় স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। ৩৬৩ খৃঃ পারস্য দেশের লোকদিগের সহিত যুদ্ধে জুলিয়ান হত হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী জোভিয়ান পারসিক দিগের সহিত এক অপমানজনক সন্ধি করিলেন। ইঁনি খৃষ্ট ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করেন এবং সাত মাস বাইশ দিনের রাজত্বের পর লোক যাত্রা সম্বরণ করেন।

৩। জোভিয়ানের পর ভালিরিয়ান দি গ্রেট সম্রাট হইলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন।

তিনি রোমের পশ্চিমাংশ আপনার জন্য রাখিয়া স্বীয় ভ্রাতা ভালেন্সকে পূর্ব্বাংশের অধিপতি করিলেন।

৪। তিনি অতি সরল-স্বভাব ছিলেন, তজ্জন্য ফলাফল বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া লক্ষ লক্ষ গলকে তাহাদিগের প্রার্থনানুসারে থ্রেস প্রদেশে বাস করিতে অনুমতি দেন। তাহারা হন্ ও অন্যান্য জাতির সহিত যোগ স্থাপন করিয়া রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং আড্রিয়ানোপলের-মহাযুদ্ধে রোমীয় সৈন্যগণকে পরাজিত ও অনেক সেনানীর সহিত ভালেন্সকে হত করিল।

৫। ইঁহার উত্তরাধিকারী গ্রেসিয়ান ও ভালেন্টাইন স্মরণযোগ্য কোন কার্য্যই করেন নাই। পরে থিয়োডোসিয়স দি গ্রেট সম্রাট হইয়া বিপক্ষগণকে পরাভব ও রোমরাজ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্র আর্কেডিয়স ও হনোরিয়স এই দুই ভ্রাতায় মধ্যে রোম রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন।

৬। আর্কেডিয়স থ্রেস, আসিয়া-মাইনর, সিরিয়া, এবং ইজিপ্ট বা মিসর দেশের উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হনোরিয়স ইটালী, বার্ক্ষে রাজ্য, গল ও ব্রিটনের রাজা হইলেন। ইহার অনতি-বিলম্বেই নূতন নূতন অসভ্য জাতি সকল (ক) একে একে পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া রোমের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল, যাহা সম্মুখে পাইল লুট ও ধ্বংশ করিতে লাগিল এবং তাহারা যেখানে আসিল সেই খানেই আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিল। ইহার দ্বারাই সমুন্নত রোম রাজ্যের অচিরাৎ অধঃপতন হইল।

৭। যে সকল অসভ্য জাতি রোমের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, অন্মধ্যে গল, হন ও লম্বার্ডিয়ান সর্ব্ব প্রধান। তাহারা বৃহৎ বৃহৎ দেশ সকল সমূলোৎখাত করিল, রোম রাজ্যের ভগ্নাবশেষোপরি নূতন রাজ্য সকল স্থাপন করিল এবং যেখানে আসিতে লাগিল সেই স্থানেই আপনাদিগের রীতি নীতি প্রচলিত করিল।

৮। অবশেষে গলাধিপতি আলারিক ৪১০ খৃষ্টাব্দে মহানগর রোম জয় করিয়া ৫ দিনের জন্য তাহা লুঠ করিতে সৈন্যগণকে আজ্ঞা দিল এবং রোম সমূলে বিনাশিত হইল। হায়! যে মহানগরী যাহা ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সকল শত্রুর আক্রমণ তুচ্ছ করিয়াছিল এবং যাহা করস্থ করিতে অদ্বিতীয় যোদ্ধা হানিবল

(ক) ভ্যাণ্ডাল, আলান, গথ, ভিসিগথ, ফ্রাঙ্ক, আনিমানি, সাক্সন্, আঙ্গল, হন, বর্গণ্ডিয়ান, লম্বার্ড, জিপিডি, আভার, শ্লেভাই, নর্ম্মাণ, বুলগেরিয়ান, সেরাসান, মুর এবং টর্ক বা তুরস্ক ইত্যাদি অসভ্য জাতি রোম রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই শেষোক্ত জাতি দ্বারা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে রোম স্থাপনের ঠিক ২২০০ বৎসর পরে আর্কেডিয়স-প্রাপ্ত পূর্ব্ব রোম রাজ্য ধ্বংশ হয়।

প্রাভৃতিরও সাধ্য হয় নাই, এক্ষণে কতক-গুলি অসভ্য লোক দ্বারা তাহা ছিন্ন ভিন্ন ও শতধাকৃত হইয়া উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইল। যে রোমের নামে মেদিনী কম্পান্বিত হইত, যে রোম বীরদর্পে সমুদায় জাতিকে অধীনস্থ করিয়া আপনার উচ্চ পাতাকা গগনমার্গে উড্ডীয়মান করিয়াছিল এক্ষণে সেই রোমের সকল চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইল।

সমাপ্ত।

কন্যার বিয়োগে—মাতার বিলাপ।

(১)

নয়নের মণি হয়ে ছিলে মাগো এ ধরায়
সহসা চলিয়া গেলে স্নেহের নন্দিনী হায়!
বড় ব্যথা লাগিয়াছে, বলি আর কার কাছে
তুমি মাগো আর ধরা দিবে না ত এ ধরায়
পরোলোকে দেখা হবে পুনঃ আশা করি তায়।

(২)

তোমার কণ্ঠের বাণী আহা কিবা সুমধুর
এখন বাজিছে কানে মোহন মধুর সুর।
সঙ্গীতের কিবা তান, মন্ত্র মুগ্ধ করে প্রাণ
কি দেখালে অপরূপ মাধুরিমা ভরপুর
দেবতার গুণ গানে দুঃখ তাপ করি দূর।

(৩)

কি যে মন্ত্র শিখেছিলে অনন্তে পুরিয়া প্রাণ
স্বর্গের অমিয় সুধা আকণ্ঠ করিতে পান।
অনন্তের উপাসনা, সে জীবনে ফুরাত না
নিশি দিন ছিল মা গো সেই তোর ধ্যান জ্ঞান,
কত ভাবে কত রসে অভিষিক্ত করি প্রাণ।

(৪)

স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দিয়ে প্রাণ প্রিয় জনে
দেখালে স্বর্গের শোভা সংসারের এ কাননে
তোমার ব্যাকুল প্রাণ, হো'ত সদা আগুয়ান,
মুছাতে গো অশ্রুধারা দুঃখিত তাপিত জনে,
ভুলিব কি কভু তাহা দেখায়েছ যা নয়নে।

(৫)

সুন্দর ফুলের মত ফুটে ছিল সে হৃদয়
যাহার সুবাস পেয়ে নর নারী সমুদায়
হইতে পাগল পারা, প্রেমে যেন মাতোয়ারা,
সাধু সাধ্বা কত জন দিল তার পরিচয়
তোমার জীবন শুধু ছিল সেবাব্রত ময়।

(৬)

দেবতার হাতে গড়া মধুর জীবন অতি
যৌবনের নব রাগে হয়েছিল মূর্ত্তিমতী,
নয়নে প্রতিভা তব, কিবা ছিল অভিনব,
মা আমার শান্তশীলা ছিলে তুমি গুণবতী
কুমারী রতন হয়ে কি দেখালে স্নিগ্ধ জ্যোতি।

(৭)

হেসে খেলে চলে গেলে চির-শান্তি-নিকেতনে
তোমা হেন ভাগ্যবতী দেখি নাই এ জীবনে।
তোমার আত্মীয় যারা, দেখ সমাসীন তারা,
পরলোকে আছে তোর কত শত প্রিয় জনে,
ভকত প্রেমিক সাধু উমেশ চন্দ্রের সনে।

(৮)

দুঃখ তাপ দূরে যাক্ মুছে ফেলি অশ্রুধার
মাগো তুমি সুখে থাক শান্তি ধামে অনিবার।
যাঁরে ভাল বেসে ছিলে তাঁরে প্রাণ ঢেলে দিলে
মা মা বলে বাহু তুলে ছুটে গেলে কোলে যাঁর,
সত্য সে আনন্দ ধামে পেলে তুমি পুরস্কার।

৯

সুর নর সমস্বরে করে সবে জয় গান,
জয় হে জগত পতি! জয় সত্য ভগবান্।
তুমি এক পিতা মাতা সকলের পরিত্রাতা
জয় শিব সিদ্ধি দাতা পুরাও সবার প্রাণ,
অনন্ত করুণা সিন্ধু চির সুখ শান্তি ধাম।

১০

যে জন কাতর প্রাণে ডাকে সত্য সনাতন!
তুমি তার প্রাণে এসে দাও শুভ দরশন।
ইহ পরলোক তুমি, আত্মার আশ্রয় তুমি
প্রাণের হে প্রিয়তম! তুমি সার নিত্যধন,
অনন্ত জীবন পথে তুমি সত্য নারায়ণ।

১১

তোমার শ্রী শ্রীচরণে সঁপি এই দেহ প্রাণ,
সুখে দুঃখে চিরদিন থাক তুমি বর্ত্তমান।
বিশ্বাস নয়নে হরি, তব কৃপা স্পর্শ করি
বিপদ দুর্দ্দিনে নাথ! কর তুমি শান্তি দান,
দুঃখী তাপী পাপী জনে এত দয়া ভগবান।

১২

প্রাণের পরম নিধি কেড়ে নিলে দয়াময়,
এত দিনে পূর্ণ হ'ল তোমার ইচ্ছার জয়।
তুমি তারে দিয়া ছিলে, তুমি তারে তুলে নিলে,
সংসারে ফুটিয়া থাকে স্বর্গের কুসুমচয়,
পুনঃ তারে নিয়ে গিয়া কর স্বর্গ শোভাময়।*

---

* এই কন্যা তাহার স্বাস্থ্যোন্নতের জন্য দীর্ঘকাল পিতা মাতার নিকট হইতে বহু দূরদেশে গিয়াছিল। ভগবানের অশেষ কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পরমানন্দে পিতামাতার নিকট আসিতে ছিল; পথিমধ্যে ভীষণ ব্যাধি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পিতামাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পথিমধ্যেই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

বানার্জ্জি গ্রেস শান্তাবালা ডাওসেশন স্কুল।
বসু অমিয়া লরেটো হাউস।
" ভক্তিমতী ভিক্টোরিয়া স্কুল।
" প্রতিভা ডাওসেশন স্কুল।
" সত্যপ্রিয়া ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।
ভট্টাচার্য্য চারুপ্রভা ডাওসেশন স্কুল।
চন্দ সুনীতি বালা ঢাকা এডেন স্কুল।
চট্টোপাধ্যায় এলা রমলা ডাওসেশন স্কুল।
চৌধুরী পুষ্পলতা প্রাইভেট।
দাস সুজাতা বেথুন স্কুল।
দাস গুপ্তা তরুলতা "
দুয়ারা সুধালতা "
" স্বর্ণলতা "
গুপ্তা সুনীতি বালা ঢাকা এডেন স্কুল।
খাস্তগীর আশালতা ময়মনসিং হাই স্কুল।
" ইন্দুলেখা বেথুন স্কুল।
মুখার্জ্জি রেণুকা "
মোজেলস্ সাঠিল লরেটো হাউস
নাগ শান্তিময়ী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
নিয়োগী সুরবালা ময়মনসিং বিদ্যাময়ী স্কুল
রায় লীলা ঢাকা এডেন স্কুল।
" প্রতিভা বেথুন স্কুল।
রায়চৌধুরী মণিকা ডাওসেশন স্কুল।
রায় লীলা "
" মণিকা "
" মণিকা "
সান্যাল চপলা প্রাইভেট।
সরকার বীণাপাণি, মহারাণী স্কুল দার্জ্জিলং
সেন গুপ্তা সুমতী ডাওসেশন স্কুল।

দ্বিতীয় বিভাগ।

বন্দ্যোপাধ্যায় বিভা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।
" শেফালিকা "
বসু ফ্লোরেন্স সরসী বালা এল, এম, এস, গার্লস স্কুল।
" আইভি ইন্দুবালা "
" পূর্ণিমা প্রাইভেট।
ভাদুড়ী সুনীতি "
বিশ্বাস মৃণালিনী ইউ, এফ, সি. হাই স্কুল।
" স্নেহলতা গার্ডেন মেমোরিয়াল।
চক্রবর্ত্তী প্রফুল্ল কুমারী "
" সুধাময়ী প্রাইভেট।
দত্ত শান্তিলতা ঢাকা এডেন।
দেবী কমলকামিনী প্রাইভেট।
গুহ লাবণ্যপ্রভা গার্ডেন মেমোরিয়াল।
গুপ্তা অরুণা লরেটো হাউস।
মৈত্রেয় কুন্দলতা প্রাইভেট।
মহান্তি ইচ্ছাবতী গার্ডেন মেমোরিয়াল।
মণ্ডল মণিপ্রভা ডাওসেশন স্কুল।
" নবলতা গার্ডেন মেমোরিয়াল।
নাগ প্রীতিময়ী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
রায় প্রতিভা ছোটনাগপুর হাই গার্লস স্কুল।
সরকার সরোজিনী ইউ, এফ, সি হাইস্কুল।

সরবান্ মেরী ডাওসেশন স্কুল।
সেন মালতী ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয় বিভাগ।

বিশ্বাস নির্ম্মল নন্দিনী ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
মিত্র বিজলী বেথুন।
" প্রতিভা "
সরকার পুলিনবালা, গার্ডেন মেমোরিয়াল।

আই, এ, পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

গুপ্তা তটিনী বেথুন কলেজ।
হালদার পরিমল ডাওসেশন কলেজ।
মজুমদার সুনীতি "
বসু সুজাতা বেথুন কলেজ।
দাস চারুলতা ডাওসেশন কলেজ।
বিশ্বাস লীলাময়ী "
গুপ্তা সুধা "
চট্টোপাধ্যায় সীতা বেথুন কলেজ।
নন্দি সরলা ডাওসেশন কলেজ।
ডলি স্পানিয়ার্ড লরেটো হাউস।
ঘোষ জ্ঞানপ্রিয়া প্রাইভেট।
ফ্লোরা এ, লটেরী লরেটো হাউস।
রায় বেলা ডাওসেশন কলেজ।
লিলিয়ান মারুক লরেটো হাউস।
খিল্‌নানি সুশীলা বেথুন কলেজ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

দত্ত ইন্দুমতী প্রাইভেট।

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

ইংরাজি অনার।

ব্রাউন কন্সটান্স ডাওসেশন কলেজ।
আনোকি ইমোলিন "

সম্মানের সহিত।

চাটার্জ্জি শান্তা বেথুন কলেজ।
" কিরণবালা ডাওসেশন কলেজ।

পাশ কোর্স।

কর নর্ম্মদা বেথুন কলেজ।
মিত্র বিভাবতী "
বিশ্বাস ইন্দুপ্রভা "
" সুরমা ডাওসেশন কলেজ।
সরকার নীহার বেথুন কলেজ।
" বিভুবালা নন্ কলেজিয়েট।
দেভেরিয়া লিলিয়ান প্রাইভেট।

নূতন সংবাদ।

১। বর্ত্তমান বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষায় কুমারী তটিনী গুপ্ত প্রথম এবং বি, এ, পরীক্ষায় ব্রাউন কনষ্টান্স ইংরাজি অনারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

২। বর্মিংহাম নগরবাসী মিঃ এসন্ নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার রেলগাড়ী আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গাড়ী কেবল মাত্র একখানি লাইনের উপর দিয়া চলে। যখন গাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়, তখন ইহা লাইন হইতে উপরে উঠে এবং শূন্যে চলিতে থাকে। এই সময় ইহার গতি ঘণ্টায় ৫০০ শত মাইল হয়।

৩। পরহিতব্রত সাধু নিত্যানন্দ দাস

মহাশয় পতিতা ও কলঙ্কিতা হতভাগিনী দিগের গর্ভস্থ সন্তান রক্ষার জন্ত নবদ্বীপে "নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির" নামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মন্দিরের কার্য্য যাহাতে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে একটী কর্ত্তব্যাবধারণ-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সূতার কাপড়ে ছিঁতা পড়িলে পরিষ্কার করিবার উপায়—দেড় আউন্স ক্লোরাইড অফ্ লাইম প্রায় তিন পোয়া গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ ছিতা ধরা স্থান গুলি তাহাতে ডুবাইয়া রাখিয়া একটু পরে শীতল জলে কাচিয়া লইলেই উহা উঠিয়া যায়।

বামারচনা।

বর্ষবরণ।

ঊষার আলোক যবে,
পূরব দুয়ার খুলি,
মুছে দিল যত দুঃখ ব্যথা পুরাতন,
নবীন কিরণ রাশি,
আকাশের গায়ে মাখি,
উজ্জল করিল মোর হৃদয় কানন।
চম্পক-কেতকী-দলে,
শীতল সুরভি বায়,
মধুগন্ধে করি পূর্ণ আবার গগন।
আবার প্রদীপ জ্বালি,
কুসুমে সাজায়ে ডালি,
এস নববর্ষ ঘরে করিগো বরণ॥
তোমার পরশে পুনঃ,
পাইয়া চেতনা ফিরি,
ঘরে ঘরে জেগে উঠে নবীন পরাণ।
কত উৎস প্রাণে ঝরে,
আশার তরঙ্গ ভরে,
সদা অনুকূল পথে করিতে প্রয়াণ।
তোমার অভয় বাণী
প্রতি প্রাণে দাও আনি,
বহাও সকল হৃদে উৎসাহ তুফান।
শিক্ষা দাও, দীক্ষা দাও,
কর্ম্মেতে মতি জাগাও
হাতে ধরি তুলি দাও উন্নতি সোপান॥
বিশ্বাস ভকতি বল,
প্রীতি প্রেম নিরমল,
গেঁথে দাও হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে।
ধুয়ে দাও আবিলতা,
মুছে যাক্ অমিলতা,
ভুলে যাই পুরাতন ভয় ভাবনারে॥
তব পায় নব বর্ষ,
ভক্তি ভরে ঢালি অর্ঘ্য,
যতনে বরিয়ে লব প্রতি ঘরে ঘরে।
কর কর আশীর্ব্বাদ,
মুছে যাক্ অবসাদ,
বাজুক নবীন বীণা সবার অন্তরে॥

সুনীতি ভাদুড়ী, কেশব ধাম
বেনারস।

ক্যাজাবায়াঙ্কা ।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

১

জলন্ত অর্ণবযানে বালক দণ্ডায়মান
করিয়াছে সেথা হ'তে অন্য সবে অন্তর্দ্ধান
রণপোত-ভগ্ন-অংশ ধ্বংস করি হুতাশন
শব রাশি দহি করে শিশু পাশে আগমন
তথাপি নির্ভীক শিশু দাঁড়ায়ে সুন্দর ভাবে,
ঝটিকা দমিতে যেন জনম তাহার ভবে,
বীরের শোণিত তার সর্ব্বদেহে প্রবাহিত
মূর্ত্তিমান গর্ব্ব যেন শিশুরূপে বিরাজিত

২

দ্রুত বেগে অগ্নি-রাশি নিকটে আসিছে তবু
পিতার আদেশ বিনা সে নাহি সরিবে কভু,
কিন্তু জনকের স্বর শ্রবণে না পশে আর,
ভূপতিত অবসন্ন মৃত কলেবর তাঁর।
কহে শিশু জনকেরে উচ্চে করি সম্বোধন,
"বল পিতঃ! কার্য্য মোর হইল কি সম্পাদন ?
না জানিল পিতা তার মৃত্যুমুখে নিপতিত,
তনয়ের তরে তিনি আর নন উচাটিত।

৩

সম্বোধি জনকে শিশু পুনঃ কহে উচ্চৈঃস্বরে
"পারি কি যাইতে আমি, বল পিতঃ! বল মোরে!"
আগ্নেয় অস্ত্রের ধ্বনি তাহারে উত্তর দিল,
দ্রুতবেগে অগ্নি রাশি গড়ায়ে কাছে আসিল
জলন্ত অগ্নির শ্বাস স্পর্শিল ললাট দেশ ;
স্পর্শিল তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত সুচারু কেশ ;
তথাপি সাহসী শিশু বিচলিত নহে যেন।
রহিল হতাশ ভাবে সেই স্থলে দাঁড়াইয়ে।

৪

একবার মাত্র আর সম্বোধি পিতায় বলে,
"বল পিতঃ! এখনও কি রব আমি এই স্থলে ?
বাদাম * ও রসারসি অতিক্রমি তার পাশে
ঘূর্ণ্যমান অগ্নিরাশি দ্রুত বেগে ধেয়ে আসে
বেষ্টিল তরণী দীপ্ত উচ্ছ্বল বৈশ্বানর
আক্রমে পতাকা উঠি উর্দ্ধ হৈতে উর্দ্ধতর
উজল অনল-স্রোত শিশুদেহ আবরিল
পতাকা সদৃশ শিখা নভস্থল আচ্ছাদিল।

৫

বিদীর্ণ হইল তরী বজ্রনিনাদের প্রায়
সেই বীর বালকের কি দশা হইল হায়!
কি দশা হইল তার জান তুমি প্রভঞ্জন
করিলে সেকালে তুমি সিন্ধু জল আলোড়ন
মাস্তুল পতাকা আদি যা'ছিল অর্ণবযানে
নিক্ষেপিয়া সে সকল বারিনিধি সন্নিধানে,
যত বস্তু হৈল নষ্ট, সকলের শ্রেষ্ঠতম
শিশুর সে ক্ষুদ্র হিয়া ছিল অতি নিরুপম।

---

* বাদাম—নৌকার পাল।

সুনীতির আশীর্ব্বাদ।

আঁধারে আলোক মম অশান্ত হৃদয়ে প্রীতি
আয় আয় কাছে আয়,
শুভ বেলা বহে যায়,
বুকে ধরে চুমি তোরে লয়ে পূর্ব্ব স্মৃতি।

সাঙ্গ হ'ল বাল্য খেলা উষার আলোক।
জীবনের নব পাতে,
আরক্তিম সুপ্রভাতে,
দেখা দিল প্রেম রশ্মি ফুটিয়া পুলকে।

কনক-দুয়ার খুলি আনন্দে জননী।
নন্দন কানন হ'তে,
পারিজাত মালা গেঁথে,
দেবী তব আসিছেন উজলি অবনী।

স্নেহের বল্লরী মোর ওগো কৃশাঙ্গিনী।
পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা,
ভক্তি নম্র বিভূষিতা,
অনবদ্যা প্রফুল্লিতা ওগো সুলাজিনী।

পাতিয়া অঞ্চল খানি আজি সে চরণে।
মাথা পাতি লহ দান,
জীবনের সুসম্মান,
সুখ শান্তি অনাবিল প্রেমের মিলনে।

দূর্ব্বা ধান সুলক্ষণ চিহ্ন কল্যাণের।
তাই দিয়ে হৃষ্ট মনে,
দিবে তোরে বরাননে,
মহাপূত আশীর্ব্বাদ সারা জীবনের।

যাবৎ সংসারে রবে হবে সুখময়ী।
সুপথ দেখাবে তোরে,
ইহ পর কাল তরে,
এই আশীর্ব্বাদ বাছা প্রতি পদে জয়ী।

সর্ব্ব মঙ্গল পূর্ণা এই দূর্ব্বা ধান।
কায় বাক্য দিয়ে,
রেখো রাণী আরাধিয়ে,
ইহাতেই শ্রী ঐশ্বর্য্য ইহাতেই মান।

সংসারের দুর্লভ যাহা বাঞ্ছিত নারীর।
এ আশীষ বরে নিত্য,
বলীয়ান হবে চিত্ত,
জ্ঞান ধর্ম্মে বিদ্যা ধনে আশ্রয় লক্ষ্মীর।

সারা জীবনের বল এই আশীর্ব্বাদ।
ধ্রুব তারা সম হ'য়ে,
লয়ে যাবে লক্ষ্য ধেয়ে,
পূরাবে আকাঙ্ক্ষা তব মিটাইবে সাধ।

মাতা পিতা যে প্রবাসে, এ আনন্দ মাঝ
বড় মেজ ছোট মামা,
ভক্তি স্নেহ অনুপমা,
দাদা দিদি ভাই বোন কুলের সমাজ।

এই সুখ সম্মিলনে তারা কেন দূরে।
আর কত পড়ে মনে,
ভাসে অশ্রু নেত্র কোণে,
তোর এই পুরস্কারে রহে কেন সরে।

আছে আছে সব আছে স্ব, স্ব, আসনে।
আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি,
পায়না দেখিতে স্বষ্টি,
বিধাতা রচিত কুঞ্জ কমল কাননে।

যে যেথায় আছ বসে কর বর দান।
সুনীতি কল্যানী মেয়ে,
রাখগো আশীষ দিয়ে
বুকের ভিতরে যার আছে যত টান।

ঢেলে দাও ঢেলে দাও আজিকে সবাই।
কাঞ্চন হীরক রাশ,
অতুল্য ইহার পাশ,
গোপন-সঞ্চিত ধন আছে যত ভাই।
আয় মা সুনীতি রাণী আয় বুকে লই।
জুড়াব মরম জ্বালা,
হেরে আনন্দের মেলা,
শুভ আশীর্ব্বাদে তোর সবে ধন্য হই।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

ছুটী ফুল।

১

কোন নন্দনের, পুণ্য ভূমি মাঝে,
ফু'টে ছিল ছু'টী ফুল।
সৌরভে গৌরবে, অতুলন অবি,
কি দিব তা'দের তুল॥

২

কি জানি কি পাপে, আসিল মর'ত
পুণ্য স্বর্গ চ্যুত হ'য়ে।
মম হৃদি বৃন্তে, ফুটিয়া হাসিল,
সেই পুণ্য ছবি লয়ে॥

৩

সংসার উদ্যানে, এক বৃন্তে মরি,
ফুটে ছিল ছুটী ফুল,
সোহাগ বাতাসে, যুগল কুসুম,
করিত গো ছুল ছুল॥

৪

স্বভাবজ রূপে, স্বভাবজ গুণে,
উজলি সংসার বাস।
সময়ে ফুটিল, গলে পরাইল,
নব মায়া নাগ পাশ॥

৫

নাহি ছিল কোন, পাপ মলিনতা,
দুঃখ ব্যথা জ্বালা হীন,
ভেবেছিনু মনে, শান্তির আলোকে,
পড়ি রব চির দিন॥

৬

কিন্তু কে বুঝিবে, বিধাতার বিধি,
এ মর জগতে হায়!
ইচ্ছা যাহা তাঁর, অবশ্য পূরিবে,
কে পারে খণ্ডিতে তায়!

৭

প্রলয় ঝটিকা, এল আচম্বিতে,
ধরিয়া ভীষণ সাজ।
সাধের উদ্যান, ছিন্ন ভিন্ন করি,
হৃদয়ে হানিল বাজ॥

৮

শুভ্র নিরমল, সৌরভে অতুল,
দু'টী ফুল অমরার।
কঠোর পীড়নে, নিপীড়িত করি,
একটী ছিঁড়িল তার॥

৯

না ছুটিতে বাস, না ফুটিতে হাস,
কুসুম কোরক মরি,
কালের প্রলয়, নিশ্বাস পবনে,
ভূতলে পড়িল ঝরি,

১০

ছিল দুটী ফুল, এক বৃন্তে মরি,
আমার হৃদয় পরে।
একটী তাহার, পড়িল খসিয়া
কালের নিশ্বাস ভরে।

১১

অন্য ফুল এবে, বিশুষ্ক মলিন,
নাহি সে লাবণ্য হায়!
বড় ব্যথা তার, বাজিয়াছে প্রাণে,
কেমনে বুঝিব তায়?

১২

কাল স্রোতে যাহা, ভেসে গেছে মম,
আর না আসিবে ফিরে।
সেই স্রোতে যেন, এ শূন্য জীবন,
ভেসে যায় পিছে ধীরে॥

১৩

দগ্ধ হৃদি হায়! আর কি জুড়াবে?
তাই বাঞ্ছা দয়াময়।
তাহারি ভাবনা, ভাবিতে ভাবিতে,
হোক্ এ জীবন লয়॥

হেমাঙ্গিনী।

চিত্র পরিচয়।

সুবিখ্যাত কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

কবি মানকুমারী বসুর নাম বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। ইনি ৺ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইহার প্রণীত "শুভ সাধনা" নামক পুস্তক ছাত্রীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়েরই পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত পুস্তক প্রণেত্রীদিগের মধ্যে আর কোন রমণীরই এরূপ সম্মান লাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী শিক্ষার যেরূপ সুবিধা হইয়াছে ইনি যে সময় শিক্ষালাভ করেন, সে সময় এরূপ সুবিধা ছিল না। ইনি নিজের চেষ্টায় এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। একজন হিন্দু বিধবা রমণীর পক্ষে এরূপ উন্নতি ও সম্মান লাভ অতি গৌরবের বিষয় ও সকলের অনুকরনীয়।

---

৩৭ নং মধুরাজের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯।১নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 611. July, 1914

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১১ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩২১। জুলাই, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

হারকিউলিস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পেটিকাবদ্ধ বস্ত্রখানি লাইকাসের হস্তে দিয়া দেয়ানীরা বলিলেন, "আমার স্বহস্ত-রচিত এই বসন খানি সযত্নে লইয়া গিয়া হারকিউলিসের হস্তে অর্পণ করিও। যুদ্ধ-জয়ের জন্য যখন তিনি দেবপূজা করিবেন তখন ইহা যেন অঙ্গে ধারণ করেন। সাবধান, বস্ত্র খানি কখনও আবরণমুক্ত করিও না। পরিধানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন রৌদ্রতেজ ও অগ্নি-তাপ হইতে ইহা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। আর এই অঙ্গুরীয়টী লইয়া যাও—তাহা হইলে ইহা কাহার উপহার তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইবে না।" আদেশ-পালনের অঙ্গীকার করিয়া লাইকাস চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরে দেয়ানীরা সঙ্গিনীগণের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল, রক্তহীন ওষ্ঠাধর ও ভয়াকুল চক্ষু দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। শুষ্ক, স্খলিত কণ্ঠে রাণী বলিতে লাগিলেন—"আমি কি করিয়াছি! Nessusএর শোণিতরঞ্জিত বসনখানি হইতে স্খলিত কয়েকটি সূত্র রৌদ্রে পড়িয়াছিল। এখনই দেখিলাম সূত্র কয়টি জ্বলিয়া উঠিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, আর সেই স্থানের ভূমি হইতে ফেনা উঠিতেছে। কি ভয়ানক! আমার স্বামীর দেহে ইহার ফল না জানি কি হইবে! এখন আমার মনে হইতেছে যে, ঔষধটিকে আলোক ও উত্তাপের মুখ হইতে দূরে রাখিতে Nessus আমাকে বারংবার বলিয়া দিয়াছিল। হায়, কি হইবে—আমি কি করিব? কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও যে ইহাতে হার-